Vol. 40 | No. 3 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব

| | |
|---|---|
| Volume | 40 |
| Issue | 3 |
| Year | 1997 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | সৈয়দ আজিজুল হক |
| Published online | February 1, 1997 |
| DOI | 10.62328/sp.v40i3.5 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v40i3.5 |
| Pages | 75-106 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব

সৈয়দ আজিজুল হক

মানবমনের বিকারক্লিষ্ট রূপ অঙ্কনের শিল্পী হিসেবে বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-৫৬) শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। চল্লিশের দশকে মার্কসীয় সমাজতত্ত্বে আস্থাস্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত মানিক তাঁর সাহিত্যে মানুষের বিকারগ্রস্ত মনোভূমির রহস্যজটিল আচরণ উন্মোচনেই অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। বলতে দ্বিধা নেই, এ কালপর্বে মানিকের শিল্পবোধ বিংশ শতাব্দীর আলোড়ন সৃষ্টিকারী মনোবিজ্ঞানীদের চিন্তা-চেতনা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল। মানুষের অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের মূলে ফ্রয়েড-আবিষ্কৃত লিবিডোর ভূমিকাকে তিনি স্বীকার করেছেন। আবার একই সাথে ইউঙের এই ধারণাকেও অস্বীকার করেন নি যে, বিদ্যমান জীবনযাত্রায় কোনো অসহনীয় আঘাতমূলক অভিজ্ঞতা কিংবা বহির্গত কোনো জটিল সমস্যার চাপ মানুষের আচার-আচরণের স্বাভাবিক শৃঙ্খলাকে বিনষ্ট করে তার মনোব্যাধির কারণ হয়। মানিক মানুষের অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের স্বরূপকে যে নানা বৈচিত্র্যসমেত বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন, তাঁর কয়েকটি গল্প আলোচনাসূত্রেই তা স্পষ্ট হবে।

## ফাঁসি

হত্যার অভিযোগে স্বামীর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা ও তা থেকে মুক্তিলাভ প্রভৃতি ঘটনার সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও বহির্বিষয়ক চাপ একজন গৃহবধূর জন্য কী তীব্র মনোবেদনার কারণ হতে পারে— তার স্বরূপসত্য উন্মোচিত হয়েছে *ফাঁসি* (প্রাগৈতিহাসিক) গল্পে। পুলিস কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়ে গণপতির কারাবাস, নিম্ন আদালত কর্তৃক ফাঁসির আদেশ এবং উচ্চ আদালত কর্তৃক সেই দণ্ডমওকুফের পর তার মুক্তিলাভ— এই সকল ঘটনায় তার স্ত্রী রমা বিস্ময়কর ধৈর্য সহিষ্ণুতা ও সুস্থিরতার পরিচয় দিলেও কারামুক্তিশেষে স্বামীর গৃহপ্রত্যাবর্তনের পর তার সহনশীলতার প্রাচীর যায় ভেঙে। একটি দিনের জন্যেও তার পক্ষে স্বামীসহ পরিচিত লোকালয়ে বসবাস অসম্ভব হয়ে পড়ে। আর নিজ মনোবাসনার প্রতি স্বামীর অসমর্থন তাকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে।

খুনের আসামীর স্ত্রী হিসেবে রমার চিত্তবিশ্লেষণে মানিক দেখিয়েছেন, গণপতির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ তার প্রতি রমাকে বিরূপ করে তোলে নি :

রমার কাছে অসহনীয় হয়েছে সমাজের নিন্দা ও কলঙ্ক। স্বামীর বিরুদ্ধে অসহনীয় ঘৃণা জাগ্রত না-হওয়ার কারণ গল্পে উল্লেখিত হয় নি; তবে অনুমান করা যেতে পারে, স্বামী-সম্পর্কিত হিন্দু নারীর শাস্ত্রসংস্কার ও সামাজিক নির্ভরতাই এর কারণ। ধর্মসংস্কারের দোহাই দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে স্বামীর প্রতি তার বিরাগ বা শ্রদ্ধাকে সে অবজ্ঞা করতে পারে, কিন্তু সামাজিক দুর্নাম, অপমান বা গৌরবহানিকে উপেক্ষা করতে পারে না। তবে তার স্বামীর যদি ফাঁসি হতো, কিংবা আমৃত্যু তার স্বামী থাকত কারাগারে তাহলে ওই সামাজিক অসম্মানের মধ্যেও রমা হয়ত বেঁচে থাকতে পারত, স্বেচ্ছামৃত্যুর পথে যেত না। এখানেই মানিক রমা-চরিত্রের মনোগত আচরণের নিগূঢ় রহস্য বিশ্লেষণ করেছেন। অর্থাৎ খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত স্বামীর অবর্তমানে তার অপবাদকে হয়ত সহ্য করা যায়, কিন্তু সেই মূর্তিমান কলঙ্ককে সঙ্গে নিয়ে পরিচিত জগৎ-মধ্যে তার লজ্জা ও গ্লানির ভারবহন সম্ভব হয় না। রমা-চরিত্র সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন অনুসরণযোগ্য :

> গণপতি পুরুষ— চারদিকের সমস্ত সংশয়, বিষ আর বিদ্রূপের মধ্য দিয়েও আবার হয়তো সে সহজ জীবনে ফিরে যেতে পারবে, কিন্তু রমার মনে যে জটিলতার গ্রন্থি পড়েছে— তার মোচন সে করবে কী উপায়ে? এই দৈনন্দিন আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যে বাইরের জগৎ প্রতিদিন ইন্ধন দেবে— মনের দিক থেকে রমা কখনো স্বামীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারবে না— এই অসহ্য দ্বিমুখী পীড়নের হাত থেকে তার নিষ্কৃতি নেই।[১]

রমা-চরিত্রের অন্তর্পীড়নের যুক্তি ও পরিণাম-বিশ্লেষণ, এ গল্পে, মানিকের অন্বিষ্ট হলেও— একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের কোনো সদস্য অকস্মাৎ মানবহত্যার মতো নিন্দনীয় ঘটনায় জড়িয়ে পড়লে ওই পরিবার ও তাদের আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে এর যে-প্রতিক্রিয়া কিংবা সামাজিক আলোড়ন সংঘটিত হয়, তার বিশদ বিবরণও তিনি উপস্থাপন করেছেন। ভদ্রযুবকের বিরুদ্ধে হত্যামামলার শুনানিকালে আদালতে কৌতূহলী জনতার বিপুল সমাগম, কলঙ্কজনক ঘটনার প্রতি পাঠকের আগ্রহ বিবেচনা করে পত্রিকায় মামলার বিশদ বিবরণ প্রকাশ, পরিচিত অনাত্মীয় মানুষের সহানুভূতিহীন উত্তেজনা, গণপতির সদ্যঃবিবাহিত অনুজার প্রতি শ্বশুরগৃহের মানসিক নির্যাতন প্রভৃতি ঘটনা সামাজিক প্রতিক্রিয়ারই অংশ। এর বিপরীতে, কারামুক্ত গণপতির প্রতি নিজ পরিবারের সদস্যবৃন্দের শ্রদ্ধাপূর্ণ ও গুরুত্বপ্রদানমূলক আচরণের যে-সতর্ক প্রয়াস, তা তাকে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে অংশীভূত করার সহানুভূতিপরায়ণ মনোভঙ্গি থেকেই পরিকল্পিত। ভারতীয় সমাজের একান্নবর্তী পরিবারকাঠামোর বৈশিষ্ট্য এটি। এছাড়া গণপতির মনোবিশ্লেষণে ব্যয়িত হয়েছে এ-গল্পের অধিকাংশ স্থান। ফাঁসির দণ্ডমওকুফের পর মুক্ত পৃথিবীতে একজন ভদ্রলোক, খুনের আসামীর মনোভূমিতে যে সূক্ষ্ম-জটিল

টানাপোড়েন কিংবা সহজ-সুস্থ আচরণের জন্য অস্বাভাবিক আগ্রহ সৃষ্টি হয়— সেসবের চিত্রও মানিক সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। এ-গল্পের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়েই কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে গণপতির দৃষ্টিকোণ থেকে। খুনের দায়ে অভিযুক্ত একটি ভদ্রযুবকের মানসবিশ্লেষণের অভিপ্রায় থেকেই মানিক এই পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে গণপতির দ্বন্দ্বরক্তিম রহস্যজটিল মনোজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রান্তগুলো পাঠক স্পর্শ করতে সক্ষম হয়। গণপতির মনোভূমি বিশ্লেষণে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াস গভীরতা-আশ্রয়ী :

> ... গণপতির মানব বিপর্যয়ের স্তরগুলি খুব সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হইয়াছে। খালাসের দিনের সন্ধ্যায়, পরিবারবর্গের সহিত পুনর্মিলনের ক্ষণে তাহার মনোভাব নিছক মুক্তির উল্লাস বা প্রিয়জনমিলনের আনন্দ নহে— নানাবিধ সূক্ষ্ম ও জটিল প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি। ... জীবনলাভের আনন্দ যে অন্যান্য তুচ্ছ আনন্দের সহিত তুলনায় অধিক বিশুদ্ধ বা প্রগাঢ় নয়, অনুভূতির রাজ্যে যে একপ্রকার গণতান্ত্রিক সাম্য আছে, উপলক্ষ্যের গুরুত্বের সঙ্গে তাল রাখিয়া যে আবেগের তীব্রতা নিয়মিত হয় না এই সত্যের আবিষ্কার; মূর্ছা; আত্মসম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য নানারূপ আত্মপ্রতারণা; নির্জন কারাকক্ষের প্রতি অতর্কিত লুব্ধতা; স্ত্রী ও পরিবারের মনোভাবের সুস্পষ্ট, ভাবাবেশহীন চকিত উপলব্ধি— তাহার ফাঁসি হইলেই যে তাহার পরিবারবর্গ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিত এই গ্লানিকর সত্য সম্বন্ধে সচেতনতা— এতগুলি বিপরীত ভাবের সংঘাত তাহার বাহিরের শান্ত স্তব্ধতার আড়ালে কোলাহল জমাইয়াছে ও মুক্তির আনন্দের মূল সুরের সহিত নানা বিরোধী সুরের সূক্ষ্ম মীড়-মূর্ছনা জুড়িয়া দিয়াছে।[২]

এভাবে মানিক এ-গল্পে ব্যক্তিগত অন্তর্ময় বাস্তবতা, পারিবারিক গৃহগত বাস্তবতা ও সমাজিক বাস্তবতা— এই সকল দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে কাহিনী বিন্যাস করেছেন।

এ-গল্পের সঙ্গে জগদীশচন্দ্র গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭) *কলঙ্কিত সম্পর্ক*[৩]-এর সাদৃশ্যের বিষয়টি আলোচনাযোগ্য। এ-সম্পর্কে প্রথম পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সুবীর রায়চৌধুরী— *জগদীশ গুপ্তর গল্প* (১৯৭৭) শীর্ষক গ্রন্থ সম্পাদনাসূত্রে (পরিশিষ্ট, পৃ. দশ)। পরে এ-বিষয়টি অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর *কালের পুত্তলিকা* (১৯৮২) গ্রন্থে উল্লেখ করেন (পৃ ৪৪৪)। "... মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত আর খাঁটি আসামি— উভয়ের ক্ষেত্রে পরিণতি প্রায় একই। কেউ আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে না।"— গণপতি ও সাতকড়ি সম্পর্কে সুবীর রায়চৌধুরীর এ-অভিমত অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সমর্থন করেছেন।[৪] কিন্তু *ফাঁসি* গল্পপাঠের পর গণপতিকে নির্দোষ বা 'মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত' বলে মনে হয় না। মিথ্যা অভিযোগের বিষয়টি গল্পে উল্লেখিত হয়েছে— কিন্তু তা আদালতে

বিচারকের সম্মুখে উকিলদের যুক্তি হিসেবে— প্রকৃত কাহিনীরূপে নয়। গল্পের নিম্নোক্ত অংশসমূহ স্মরণযোগ্য :

> ক. খুনের দায়ে জেলে গিয়া রোগা হইয়া আসিবার অধিকার এ জগতে কারো তো নাই— সে তো পাপের ফল... (৩।।৪১২)
>
> খ. গণপতির বিরুদ্ধে পিসীর অভিযোগ : 'ঠাকুর-দেবতা কিছু তো মানবি নে, শুধু অনাচার করে বেড়াবি।' (৩।।৪১৫)
>
> গ. ... দেশের ও দশের কাছে সে পরিবারের মাথা হেঁট করিয়া দিয়াছে। আইনের আদালতে ভালরকম প্রমাণ না হোক, মানুষের আদালতে তার পাশবিকতা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। ফাঁসির হুকুম রদ হোক, এ ব্যাপারের এইখানে শেষ নয়, এখনও অনেক বাকী,— অনেক মন ও মানের লড়াই। ... (৩।।৪১৮-১৯)

এসব অংশ গণপতির নিরপরাধের প্রমাণ অবশ্যই নয়। তবে *কলঙ্কিত সম্পর্ক* গল্পে সাতকড়ির অপরাধের বিবরণ যেরকম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, *ফাঁসি* গল্প তা থেকে ব্যতিক্রম। গণপতি আইনের কূটতর্কে মুক্তি পেলেও নিরপরাধ সে নয়। কিন্তু হত্যার ঘটনায় সে কী পরিমাণে জড়িত সে তথ্য রহস্যজাল দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে। জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়— উভয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে বস্তুতন্ত্রের প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে বৈভিন্ন্যের সূত্র নিহিত হয়ে আছে কাহিনীবিন্যাসের প্রক্রিয়াগত এই মনোভঙ্গির ক্ষেত্রে।

স্মরণীয় যে, মানবমনের পাপপ্রবণতা, পাপ ও পাপকার্যের বিস্তৃত বর্ণনাপ্রদানে জগদীশ গুপ্ত স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করলেও মানিকের অনুসন্ধানী দৃষ্টি সর্বদা নিহিত থাকে চরিত্রের গহন-গভীর অন্তর্লোকে। সমাজদৃষ্টিতে কোনটি পাপকর্ম, কোনটি অন্যায়কার্য— তা নিয়ে মানিক আদৌ চিন্তিত হন না; বরং তিনি মানুষের কোনো অস্বাভাবিক আচরণের প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্যসমূহকেই সবসময় সন্ধান করেন। দুজন কথাশিল্পীর জীবনদর্শনগত দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যকে স্মরণে রাখলে আলোচ্য গল্পদ্বয়ের ভিন্ন ভিন্ন রসপরিণামকেও আমরা যথার্থভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হবো। জগদীশ গুপ্তর কাছে সাতকড়ি ব্যভিচারী— অর্থাৎ পাপী, অপরাধী; অন্যদিকে গণপতির হত্যাকার্যের সঙ্গে জড়িত হওয়ার বিষয়টি মানিকের কাছে একটি অস্বাভাবিক আচরণমাত্র। সে-কারণে "উভয়ের পরিণতি প্রায় একই"— সুবীর রায়চৌধুরীর এ-অভিমতও তর্কাতীত নয়। কারাবাস-পূর্ব দাম্পত্যজীবনে দুজনের কেউই পুনরায় স্থিত হতে পারল না— শুধু সেদিকে লক্ষ রেখে সাতকড়ি ও গণপতি চরিত্রের পরিণতিকে পরিমাপ করা যাবে না। কেননা উভয়ের দাম্পত্যজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার পেছনে তাদের স্ত্রীদ্বয়ের ভূমিকাই মুখ্য। তবে সে-আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে দুটি চরিত্রের ভিন্নতর পরিণতির দিকে আমাদের দৃষ্টি

ফেরাতে হবে। *কলঙ্কিত সম্পর্ক* গল্পে সাতকড়ি ব্যভিচারের ঘটনায় গ্রেপ্তারের পর দেড়বছরের কারাদণ্ডশেষে মুক্ত হয়ে গৃহপ্রবেশের পূর্বে পুরো একটি দিন পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে অনাচারেই প্রবৃত্ত থাকে। গ্রেপ্তার কিংবা কারাভোগ তার মধ্যে অপরাধবোধ জাগ্রত করতে কিংবা তার মানসিক পরিবর্তনে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে নি। অন্যদিকে ফাঁসির দণ্ডমওকুফের মধ্য দিয়ে ছমাসের কারাবাসশেষে মুক্ত পৃথিবীতে গণপতি প্রথমেই ভাবে, তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের মর্যাদাগত যে ক্ষতিসাধিত হয়েছে, কত দ্রুত তা পূরণ করা যায়। দুটি চরিত্রের এই দ্বিবিধ পরিণতিই এর স্রষ্টাদ্বয়ের মানসপ্রবণতার ভিন্নতা সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তোলে। জগদীশ গুপ্তের গল্পে অপরাধীর চিত্ত অপরিবর্তনীয়। অন্যদিকে মানিক বৃহত্তর কল্যাণের দিকে পাঠকের দৃষ্টি ফেরান।

গণপতির স্ত্রী রমা ও সাতকড়ির স্ত্রী মাখনের মনোগত অভিঘাতের গভীরতাকে উভয় লেখক গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন করেছেন। স্বামীর অন্যায় আচরণ স্ত্রীর মানসিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রাখে— এই গুরুত্বপ্রদানের মধ্য দিয়ে সেই সত্যকে উভয়ে পরিস্ফুটিত করে তুলেছেন। কারামুক্ত স্বামীর সঙ্গে এ-দুই চরিত্রের কেউই আর পূর্ব-সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে সক্ষম হলো না— সে-বিবেচনায় উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যসন্ধান সম্ভবপর হওে তাদের পার্থক্যও কম নয়। মাখনের কাছে তার স্বামী ঘৃণিত ও স্পর্শ-অযোগ্য; কিন্তু রমার কাছে তা নয়। রমার কাছে সামাজিক কলঙ্কই মূল অন্তরায়— আর এই অপমানবোধই তাকে আত্মহত্যায় উদ্বুদ্ধ করে। অন্যদিকে মাখন তার স্বামীকে পরিত্যাজ্য ভাবলেও, রমার মতো, পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ বা বিকল্প সন্ধানে সক্ষম হয় নি। এক্ষেত্রে তার শাশুড়ির অতিপুত্রস্নেহ মাখনকে গৃহবিতাড়নের পথ করে দিয়েছে। তবে বহির্বিষয়ক এসব ঘটনার অন্তালে এ-দুই নারীর হৃদয়যন্ত্রণার দিকে যদি আমরা দৃষ্টি দেই, তাহলে সেখানে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। স্বামীর অনৈতিক কর্মকাণ্ড এ-দুই নারীর মধ্যে যে-গভীরতর বেদনা, চিত্তদাহ ও মানসসংকটের জন্ম দিয়েছে এবং তাতে উভয় নারীর যে-অসহায়ত্ব ও নিরুপায়ত্ব ফুটে উঠেছে— তা উভয় গল্পে সামীহীন করুণ রসের সঞ্চার করেছে। স্বামীর (বা পুরুষের) অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো শেষপর্যন্ত স্ত্রীর (বা নারীর) জীবন দিয়ে— উভয় গল্পের এই কাহিনী-পরিণতি সমাজের যে-গভীরতর সত্যটিকে মূর্ত করে তোলে, তা হলো : এই পুরুষপ্রধান সমাজে নারীর জীবনের মূল্য মানুষের সমান নয়।

প্রথম প্রকাশের দিক থেকে জগদীশ গুপ্তের *কলঙ্কিত সম্পর্ক* (*আহুতি* নামে) মানিকের *ফাঁসি* গল্পের অগ্রগামী। কিন্তু মানিক জগদীশ গুপ্তের গল্প দ্বারা প্রভাবিত

হয়েছিলেন কিনা, তাঁর জীবন পাঠ করে তা জানা যায় না। তবে দুই গল্পের কাহিনীবর্ণনায় কিছু কিছু সাদৃশ্য অতি স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। উভয় গল্পের সাদৃশ্যমূলক কিছু অংশের উদাহরণ নিম্নে উপস্থাপন করছি :

১. উভয় গল্পে কারামুক্তিশেষে গৃহপ্রত্যাবর্তনের পর বৌদির [উভয় গল্পে একজন করে বৌদি আছে যারা আসামীর স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল] কুশলজিজ্ঞাসা, তার উত্তর ও প্রতিক্রিয়া :

ক. বউদি গোলাপ কেবল জিজ্ঞাসা করিল, — ভাল আছ?

সাতু বলিল, —তোমাদের আশীর্বাদে।— বলিয়া হাসিল। হাসিটা হঠাৎ কটু মনে হইয়া গোলাপের মন আরো খারাপ হইয়া গেল। ... (জ.গু.র. ২।। পৃ ৩৫৪)

খ. ... পশুপতির স্ত্রী পরিমল বলিল, কি চেহারাই তোমার হয়েছে ঠাকুরপো!

গণপতি গলা সাফ করিয়া মৃদু একটু হাসিয়া বিনয়ের সঙ্গে বলিল, আর চেহারা...?

যার জীবন যাইতে বসিয়াছিল, চেহারা দিয়া সে কি করিবে— এই কথাটাই গণপতি এমনিভাবে বলিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু শোনাইল অন্যরকম, মনে হইল, বৌদির স্নেহপূর্ণ উৎকণ্ঠার জবাবে সে যেন ভারি রূঢ় একটা ভদ্রতা করিয়াছে।... (৩।।৪১২)

২. *কলঙ্কিত সম্পর্ক* গল্পে ভ্রাতুষ্পুত্র এবং *ফাঁসি* গল্পে ভ্রাতুষ্পুত্রী কর্তৃক সরল জিজ্ঞাসা, ও তার উত্তরে যাতে অপ্রিয় সত্য বেরিয়ে না-আসে, সেদিকে অভিভাবকমহলের সতর্কতা :

ক. নিতু তার ছড়ানো পায়ের ফাঁকে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল— কোথায় ছিলে কাকা এতদিন?

বালকের ঐ একই প্রশ্ন—

কিন্তু একবারও তাহার উত্তরের আশা মিটিল না; ভূতপূর্ব বাসস্থান সম্বন্ধে সাতু একটা অপ্রকৃত উত্তর গড়িয়া না তুলিতেই বিরাজ রান্নাঘর হইতে সেখানে আসিয়া পড়িলেন; বলিলেন,— তোর সে কথায় বারবারই কাজ কি রে লক্ষ্মীছাড়া? পালা এখান থেকে। (জ.গু.র. ২।। পৃ ৩৫৬)

খ. ... পশুপতির সাতবছরের মেয়ে মায়া বলিল, পিসীমাকে শ্বশুরবাড়িতে রোজ মারে, কাকা।

গণপতি অবাক হইয়া বলিল, মারে?

মায়া বলিল, তুমি মানুষ মেরেছ কি-না তাই জন্যে।

তিন চারজন একসঙ্গে ধমক দিতে মায়া সভয়ে চুপ করিয়া গেল। ... (৩।।৪১৪)

৩. কারামুক্তির পর উভয় আসামীর নির্বিকারত্ব :

ক. নিতুর প্রশ্নে, এবং ভর্ৎসনা দিয়া মায়ের এই চাপা দিবার চেষ্টায়, তাহার মনে ঘুণাক্ষরেও একটু বিকার উপস্থিত হইল না; বলিল— আহা, বসুক না। বলিয়া সে নিতুকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া বসাইল; ... (জ. গু. র. ২।। পৃ ৩৫৬)

খ. পশুপতি একবার প্রস্তাব করিয়াছিল যে, গণপতি নিজের ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া বিশ্রাম করুক। গণপতি নিজেই তাহাতে রাজী হইল না। মূর্ছা ভাঙিবার পর নিজেকে লুকানোর ইচ্ছাটা কি কারণে যেন তাহার কমিয়া গিয়াছে! (৩।।৪১৩) কিংবা,

রাত্রি ন'টার সময় বৃষ্টি বন্ধ হইলে, পাড়ার দু' একজন ভদ্রলোক এবং পাড়ার বাহিরের দু' চারজন বন্ধু-বান্ধব দেখা করিতে আসিলেন। পশুপতির ইচ্ছা ছিল, গণপতি আজ কারো সঙ্গে দেখা না-করে— সে-ই সকলকে বলিয়া দেয় যে, গণপতির শরীর খুব খারাপ, সে শুইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু গণপতি একথা কানে তুলিল না, নীচে গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা ও বসিয়া আলাপ করিল। ... (৩।।৪২০)

৪. কারাবাসকালীন সময়ে সংঘটিত নানা ঘটনার তথ্যপ্রদানসূত্রে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রয়াস :

ক. বিরাজ সাতুকে দেশের খবর, অর্থাৎ পরিচিত মানুষের জন্ম মৃত্যু বিবাহের খবর শুনাইতে লাগিলেন; সাতু তাহা তামাক টানিতে টানিতে শুনিতে লাগিল। (জ. গু. র. ২।। পৃ ৩৫৬)

খ. অল্পে অল্পে একথা-সেকথা হইতে কথাবার্তা অনেকটা সহজ হইয়া আসিল। ছ'মাসের মধ্যে আত্মীয়স্বজন অনেকের সঙ্গেই বহুবার গণপতির দেখা হইয়াছে, তবু সে এমনভাবে কথা বলিতে লাগিল, যেন ওই সময়কার পারিবারিক ইতিহাসটা ঘুণাক্ষরে জানিবার উপায়ও তাহার ছিল না। তিনমাস আগে জেলে বসিয়া পশুপতির কাছে বাড়ীর যে ঘটনার কথা শুনিয়া সে আশ্চর্য হইয়াছিল, আজ পিসীমার মুখে সে ঘটনার কথা শুনিয়া সে নবজাগ্রত বিস্ময় বোধ করিল, এমন কি— যে ব্যাপার এখানে সে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া জেলে গিয়াছিল— পরিমল তার বর্ণনা দিতে আরম্ভ করিলে, আজই যেন প্রথম শুনিতেছে এমনিভাবে শুনিয়া গেল। (৩।।৪১৪)

দুটি গল্পের অভ্যন্তরীণ এসব সাদৃশ্যনির্দেশক অংশসমূহের সমান্তরাল উল্লেখে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়। একদিকে যেমন জগদীশ গুপ্তের গল্প পড়ে মানিক প্রভাবিত হয়েছিলেন এমন সন্দেহ জাগে, অন্যদিকে তেমনি শিল্পী হিসেবে মানিকের স্বাতন্ত্র্যের সূত্রগুলিও আলোকিত হয়। ঘটনার সরল বর্ণনা বা উপস্থাপনার পরিবর্তে

মানিক কাহিনীবিন্যাস রীতিতে চরিত্রের মনোগত প্রতিক্রিয়া ও বিশ্লেষণকেই প্রাধান্য দেন। এক্ষেত্রে তার সাফল্যও চূড়াস্পর্শী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, *চোর* গল্পের মতো *ফাঁসি*তেও মানিক কাহিনী রূপায়ণে ড্রামাটিক আয়রনির আশ্রয় নিয়েছেন। *ফাঁসি* নামকরণের মধ্যেই এর আভাস মেলে। গলায় ফাঁস লাগিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আদেশ জারি হয়েছিল গণপতির বিরুদ্ধে; আইনের মারপ্যাচে সেই মৃত্যুদণ্ড থেকে গণপতি পরিত্রাণ পেলেও একই প্রক্রিয়ায় জীবন দিল তার নিরপরাধ স্ত্রী। যদিও স্বেচ্ছামৃত এই জীবনদান— কিন্তু এর মধ্য দিয়ে মানিক যেন একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তা হলো : মানবজীবনের বহমান পটভূমিতে সকল কর্মেরই ফলভোগ অনিবার্য— সৎকর্মের যেমন সুফল রয়েছে তেমনি অসৎকর্মের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাভোগ। বৈজ্ঞানিক সূত্র অনুযায়ী, প্রতিটি ক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ার মতো প্রকৃতি জগতের বিধান যেন মানবজীবনপ্রবাহেও সমানভাবে সক্রিয়। একটি হত্যার বদলে আরেকটি হত্যা, একটি যন্ত্রণার বিনিময়ে আরেকটি যন্ত্রণা— মানবজীবনের এটাই যেন নিয়তি, অনিবার্যতা। তবে প্রতিক্রিয়াটি সবসময় প্রত্যক্ষ না-ও হতে পারে। এ-গল্পে যেমন গণপতি নিজে মৃত্যুর প্রত্যক্ষ যন্ত্রণা এড়াতে সক্ষম হলেও স্ত্রীর মৃত্যুজনিত যন্ত্রণাভোগ থেকে মুক্তি পেল না। সমগ্র গল্পকাঠামোর গাম্ভীর্যের সঙ্গে পরিণতির এই করুণসুর সংযোজিত হয়ে বক্তব্যবিষয়ের ব্যঞ্জনাকে দীপ্ত করে তুলেছে।

**ভূমিকম্প**

মনোরোগগ্রস্ত একটি চরিত্রের নিখুঁত চিত্রাঙ্কনেই *ভূমিকম্প* (প্রাগৈতিহাসিক) গল্পটি তাৎপর্যপূর্ণ। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রসন্নর রাত্রিকালীন নিদ্রার মধ্যে ভূমিকম্প শুরু হলে অন্ধকার গৃহাভ্যন্তরে সে বন্দি হয়ে পড়ে। উচ্চকণ্ঠ মাতৃ-আহ্বানে তার নিদ্রার অবসান হলে পরিস্থিতির ভয়াবহতা সে উপলব্ধি করে, কিন্তু দ্রুত গৃহ থেকে বহির্গমনের পথ পায় না। ফলে সেই অন্ধকার ভূকম্পনপীড়িত পরিস্থিতিতে গৃহাবদ্ধতা তার মনে এক স্নায়ু-ছেঁড়া মৃত্যুভীতি সঞ্চার করে। স্বল্পস্থায়ী আতঙ্কের এই দুর্বিষহ স্মৃতিই তার অবচেতন মনে সৃষ্টি করে এক দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতচিহ্ন। অতঃপর মৃত্যুভাবনার অন্তর্পীড়নজাত এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে নানাভাবে। দীর্ঘক্ষণের উপবিষ্ট-অবস্থা থেকে অকস্মাৎ দণ্ডায়মান হলে কিংবা উচ্চৈঃস্বরে নাম-ধরে কেউ সম্বোধন করলে প্রসন্নর মাথার মধ্যে একটি কালোপর্দা দুলতে থাকে। পর্দার প্রান্তগুলো অন্ধকার দিয়ে বোনা এবং ঝাপসা অন্ধকারের দেয়ালে তা আটকানো। এর দুবছর পরে চাকরির চেষ্টায় মাদ্রাজ ঘুরে এলে তার

মাথা থেকে এই কালোপর্দা অন্তর্হিত হলেও আবির্ভাব ঘটে নতুন উপসর্গের। ভয়, অনিশ্চয়তা ও সন্দেহের নানা বাতিক সৃষ্টি হয় মনোমধ্যে। সামান্য পোষাক-পরিচ্ছদ চুরির ভয়ে যাত্রাপথে বিনিদ্র রাত্রিযাপন, সমস্ত রাত্রির অচেতন অসহায় অবস্থা কল্পনা করে নিদ্রাহীনতার রোগ, মাসিক পত্রিকার ধাঁধার উত্তর মেলাতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষোভে-ক্রোধে বিচলিতবোধ, বিছানায় ভালোভাবে মশারি গুঁজে শুয়েও কোথাও ফাঁক রয়ে গেছে এই নিয়ে সন্দেহের বাতিক কিংবা বহির্দ্বার তালাবদ্ধ করেও প্রতিরাতে চৌকির নিচে চোরের অনুসন্ধান, হৃদয়বৃত্তিগুলোর তীক্ষ্ণ সতেজতালাভ, অনুভবশক্তির আশ্চর্যরকম বিকাশ, অবাস্তব কল্পনা ও ভাবপ্রবণতার প্রকোপ, বিমর্ষতা ও বেঁচে-থাকার অর্থহীনতা উপলব্ধি প্রভৃতি তার মনোজগতে সৃষ্ট নতুন নতুন উপসর্গের নানা দিক। এর মধ্যেই এক আশ্চর্য স্বপ্নদর্শন ঘটে তার। ভীতিকর সে-স্বপ্ন— পর্বতের উচ্চপ্রদেশ থেকে তার পতন ঘটছে, পর্বতের ঠিক নিচে অজানা রহস্যময় অন্ধকারাচ্ছন্ন এক ইদারা, ইদারার ভেতরভাগে পড়ার বিপদ এড়িয়ে সে শূন্যে সাঁতার কেটে অবশেষে ইদারার পাড়ে আছড়ে পড়ে। স্বপ্নবিশ্লেষণ-সংক্রান্ত ফ্রয়েডের মৌলিক আবিষ্কারসমূহ যদি আমরা স্মরণ করি, তাহলে প্রসন্নর এই স্বপ্নেরও একটি প্রাসঙ্গিক যুক্তিসমর্থিত ব্যাখ্যাপ্রদান সম্ভবপর। ফ্রয়েডের মতে,

> শিশুকে আদর করতে গিয়ে বড়রা অনেক সময় তাকে হাত বা পা ধরে শূন্যে দোলাতে থাকে। বড় হলে তাই অনেকে শূন্যে ভাসার স্বপ্ন দেখে থাকে। কিন্তু আসলে এ-ধরনের স্বপ্নের সঙ্গে যৌনতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। মনঃসমীক্ষণের দ্বারা জানা যায় যে প্রথম যৌন চেতনার সঙ্গে ছোটবেলায় দোল খাওয়া, লম্ফ-ঝম্ফ, কোন কিছু বেয়ে ওপরে ওঠা, ইত্যাদির সম্পর্ক আছে; অর্থাৎ এই সব কাজ করার সময়ই বালক-বালিকারা প্রথম যৌনতা বোধ করে। তাই স্বপ্নে শূন্যে ভাসার সঙ্গে যৌনতার যোগসূত্র আছে।[৫]

এ-গল্পে আমরা লক্ষ করি, স্বপ্নদর্শনশেষে ঘুমভেঙে প্রসন্নর মধ্যে জাগ্রত হয় এক নৈঃসঙ্গ্যচেতনা— আর সেই সঙ্গে স্ত্রীর অভাববোধ। স্বপ্নভঙ্গের পর তার নিদ্রাহীন আলো-জ্বালা অবস্থান লক্ষ করে মাও, কাকতালীয়ভাবে, তাকে বিয়ের অনুরোধ জানায়। একইসময়ে পিতৃবন্ধু, অফিসের বড়বাবু, তার নিজ কন্যার পাণিগ্রহণের জন্য প্রসন্নর নিকট প্রস্তাব দেয়। তবে সামাজিক অবস্থানগত বৈষম্যের কারণে, এমন আকস্মিক প্রস্তাব প্রসন্নর মনে একই সঙ্গে দ্বিধা, ভীতি ও পলায়নবৃত্তির অনুষঙ্গ সৃষ্টি করে। ওইদিন লিফটের ক্ষুদ্র-বদ্ধাবস্থা পরিহার করে সিঁড়ি-ভাঙার ঘটনা তার আতঙ্কতাড়িত মনে ভূমিকম্পগ্রস্ত বদ্ধগৃহের স্মৃতি জাগরণেরই প্রমাণ। অবশেষে এই শঙ্কাদুষ্ট স্মৃতিতাড়নার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বাসররাতে— আরও তীব্র ও উৎকটরূপে। বাঙালিজীবনে বাসররাতের কৌতুক হিসেবে বাসরগৃহের দরজা যখন বহির্দিক

থেকে সশব্দে বন্ধ করা হয়, প্রসন্নর মন তখন এক অসহনীয় ভীতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই নিঃশব্দে দ্বারমুক্ত হবে— এমন নিশ্চয়তার কথা জেনেও ওই সময়ে প্রসন্নর মধ্যে যে-ভীতিবিহ্বলতা, চিত্তবৈকল্য কিংবা উদ্বেজন আমরা লক্ষ করি, তা বদ্ধস্থানে থাকার আতঙ্কজনক ব্যাধিরই (claustrophobia) সুস্পষ্ট প্রকাশ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে ভূমিকম্পজনিত কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা জানা যায় না। এ-সম্পর্কিত একটি ভয়াবহ যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে আছে— তবে সেটি অপ্রত্যক্ষ। ১৯৩৪ সালে বিহারে প্রবল ভূমিকম্পের সময় মানিকের পিতৃপরিবারের একটি বড়ো অংশ সেখানে এর শিকার হয়। মানিকের মধ্যমভ্রাতার একটি কন্যা নিহত ও একটি আহত হয়। মানিক তখন কলকাতায়; ভূমিকম্পের সংবাদ পেয়ে দ্রুত তিনি মুঙ্গেরে পৌছান এবং ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পরিবারের সদস্যদের সন্ধান করে বেড়ান। ওই ভূমিকম্পে মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু ধূলিসাৎ হয়ে যায়— মুঙ্গেরের একটি গৃহও অক্ষত থাকে নি। স্মরণীয় যে, মধ্যমভ্রাতার পরিবারের সঙ্গেই মানিকের কিছুটা সদ্ভাব ছিল। সুতরাং তারই দুকন্যার হতাহতের ঘটনা মানিকের হৃদয়যন্ত্রণাকে অধিকতর তীব্র করেছিল, সন্দেহ নেই। তবে ভূমিকম্পের এসব অভিজ্ঞতার সঙ্গে এ-গল্পের স্পষ্ট কোনো যোগ আছে কিনা— এ-যাবৎকালে উদঘাটিত মানিকের জীবনতথ্য থেকে তার সন্ধান মেলে না। সে-কারণে বলা যায়, ভূমিকম্পের মধ্যে গৃহাবদ্ধতা কোনো ব্যক্তির মনে যে স্থায়ী আতঙ্ক বা ফবিয়ার সৃষ্টি করে, তার প্রবণতাসমূহ উদঘাটনই এ-গল্পের লক্ষ্য। সেদিক থেকে একে একটি নিরীক্ষাধর্মী গল্পও বলা যায়।

স্বীকার্য যে, আধুনিক মনোবিজ্ঞান নির্দেশিত ক্ল্যসট্রাফবিয়ার লক্ষণগুলোর সঙ্গে প্রসন্নর মানসিক প্রতিক্রিয়াসমূহের পূর্ণতর সাদৃশ্য বিদ্যমান। মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, কোনো ভীতিকর পরিস্থিতির সঙ্গে তীব্রমাত্রায় অনুবর্তন ঘটলে ব্যক্তির মধ্যে যে-গভীর ভীতিমূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয়, তারই নাম ফবিয়া।[৬] অস্বাভাবিক মানসিক চাপ বা পীড়নসৃষ্টিকারী পরিবেশ দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে ওইরূপ মনোব্যাধির উদ্ভব ঘটতে পারে। ব্যাধির উৎসভেদে ভয়ের রূপ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, যেমন : খোলা-জায়গার ভয়, উচ্চস্থানের ভয়, বদ্ধজায়গার ভয়, নির্জনস্থানের ভয়, ভীড়ের ভয়, রক্তের ভয়, অন্ধকারের ভয়, জীবন্ত সমাধিস্থ হওয়ার ভয় প্রভৃতি।[৭] *ভূমিকম্প* গল্পে প্রসন্নর মধ্যে বদ্ধস্থানের আতঙ্কজনিত যে-ব্যাধি তার উৎসনির্দেশ এবং তার মনোগত আচরণের পরবর্তী স্তরসমূহের স্বরূপ উন্মোচনে মানিক প্রখর অনুভববেদ্যতা ও শিল্পী হিসেবে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ফলে বাস্তব-অতিরেক যান্ত্রিকতা প্রশ্রয় না পেয়ে গল্পে প্রাণের যোগ ঘটেছে পরোপুরিভাবেই।

এ-গল্পে প্রসন্নর মানসসংকটের পরিচয় উদঘাটনসূত্রে দুটি সমাজচিত্রের পরিস্ফুটন আমরা লক্ষ করি। বাসররাতে নবদম্পতির সঙ্গে কৌতুক করার একটি গতানুগতিক সামাজিক আবহনির্মাণের বাইরে এ-গল্পে রূপায়িত হয়েছে সমাজজীবনের একটি নির্মম বাস্তবতার দিক। প্রশাসনিক শোষণ প্রক্রিয়ায় অফিসের কর্তাব্যক্তিদের যে-প্রতাপ এবং তাদের ইচ্ছার নিকট নিম্নপদস্থদের যে-অসহায়ত্ব তারই একটি ক্ষুদ্ররূপ অঙ্কিত হয়েছে এ-গল্পে। অফিসের বড়বাবু পিতৃবন্ধু হওয়ায় প্রসন্নর চাকরির সুযোগলাভ, পরবর্তী পদোন্নতি ও বেতনবৃদ্ধি প্রভৃতি যেমন সহজ প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয়েছে, তেমনি প্রসন্নকে জামাতা হিসেবে পাওয়ার প্রস্তাব উপেক্ষা করা প্রসন্নর পক্ষে সম্ভবপর হয় নি ওই সবকিছু হারানোর ভয়ে। গল্পের আভ্যন্তর-সাক্ষ্য নিম্নরূপ :

> ১. চাকরি পিতৃবন্ধুর কল্যাণে। পিতৃবন্ধু আপিসের বড়বাবু। ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় প্রসন্নকে তিনি ভালবাসেন। ... সুতরাং অল্পকালের মধ্যে প্রমোশন হইল। সবদিক দিয়াই সে উপরে উঠিল, তাহার মাহিনা যেমন বাড়িল সত্তর থেকে আশী টাকায়, তাহাকে কাজ করিতে হইল একতলা হইতে একেবারে চারতলায় উঠিয়া গিয়া। (৩।।৪২৯)
>
> ২. 'আমি যদ্দিন এখানে বড়বাবু আছি, মাইনে বাড়ার ভাবনাটা তোমার ভাবতে হবে না বাপ।' বলিয়া বড়বাবু হাসিলেন। (৩।।৪২৯)
>
> ৩. ... দুর্ভাবনায় ঘামে হাতের তেলো ভিজাইয়া প্রসন্ন নীরবে আগাগোড়া সবটাই শুনিল। বড়বাবুর কন্যাটিকে সে দেখিয়াছে। লোভ করা যায় এমন সে মেয়ে, তাছাড়া বাপ তার বড়বাবু। হইলে সব দিক দিয়া ভালই হয়। প্রসন্ন কিন্তু কিছুমাত্র উৎসাহ পাইতেছিল না। ... ও মেয়ের সঙ্গে একা এক ঘরে বসিয়া আছে কল্পনা করিলেও তাহার বুকের মধ্যে টিপটিপ করিতে থাকে। ওকে বিপদ বলিয়া ভাবা যায়, বউ বলিয়া কোনমতেই যেন ভাবা যায় না।
>
> এদিকে বড়বাবুকে 'না' বলিবার সাহসই বা সে কোথায় পায়? (৩।।৪২৯-৩০)

প্রশাসনিক কর্মপ্রক্রিয়ায় সরকারি-বেসরকারি সবধরনের প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের স্বার্থদুষ্ট ইচ্ছার কাছে নিম্নপদস্থদের সাহসহীনতা, সংকোচপরায়ণতা ও নিরুপায়ত্বের এরূপ উদাহরণ, বলা বাহুল্য, আজও সমভাবে বর্তমান।

### অন্ধ

অন্ধ (প্রাগৈতিহাসিক) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সনাতনকে মানিক রূপায়িত করেছেন তার অপরাধবোধতাড়িত জীবনাচরণ, দুঃখবিস্মৃতির উপায়স্বরূপ তার পানাভ্যাস এবং পরিণতিতে আসক্তি, অন্ধত্বলাভ ও পুরোপুরিভাবে স্বার্থপীড়িত

জীবনবোধসমেত। দোতলা অট্টালিকা নির্মাণকালে অর্থাভাবে স্ত্রীর অলংকার বিক্রি করলে সেই শোকে চাকরিজীবী সনাতনের স্ত্রী সাতবছরের একমাত্র কন্যা ও স্বামীকে রেখে প্রথমে গৃহত্যাগ ও পরে মৃত্যুবরণ করে। স্ত্রীর প্রতি গভীর মমত্ব ও ভালোবাসার ফলে সনাতনের মধ্যে, এই ঘটনায়, কতগুলো মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। একদিকে সীমাহীন অনুশোচনা, অনুতাপ, পাপবোধ, অন্যদিকে কন্যার প্রতি স্নেহশূন্য বিরাগ, আত্মক্ষয়ী জীবনমমতা, একান্ত স্বার্থপুষ্ট অস্তিত্বরক্ষার আকাঙক্ষা প্রভৃতি অনুষঙ্গ তার পরবর্তী জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সনাতনের মনোমধ্যে শেকড়ায়িত স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত পাপবোধের পরিচয় প্রসঙ্গে মানিক লিখেছেন:

> এ জগতে সবাই পাপী। অন্য পাপ যে করে না, মানুষের মনে ব্যথা তো অন্ততঃ সে দেয়, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, জানিয়া হোক, না জানিয়া হোক, মানুষের মনে ব্যথা দেওয়ার চেয়ে বড় পাপ মানুষকে খুন করাও নয়। (৩।।৪৩৫-৩৬)

স্ত্রীর গৃহপরিত্যাগ ও মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করার পর সনাতন যে-আত্মপীড়ন ও গ্লানিজর্জরতার সম্মুখীন হয়, নিয়মিত অনুতাপের মধ্য দিয়েই তা থেকে সে মুক্তি খোঁজে। আর এই তীব্র অনুশোচনাজনিত হৃদয়দহন থেকে মুক্তিকল্পে সে নিমজ্জিত হয় নিয়মিত পানাভ্যাসে। সনাতনের এ সকল আচরণের মধ্য দিয়ে যে-প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ আমরা লক্ষ করি, ফ্রয়েডকথিত মৃত্যুপ্রবণতার সঙ্গে তা সম্পর্কযুক্ত। ফ্রয়েড মানুষের সহজাত আদিম প্রবৃত্তির মধ্যে দুটি ভিন্নতর রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি এর একটির নাম দিয়েছেন জীবনপ্রবৃত্তি, অন্যটির মরণপ্রবৃত্তি। —অস্তিত্বরক্ষার উদ্যমের পাশাপাশি মানুষের মধ্যে একপ্রকার আত্মক্ষয়ী উদ্দীপনার কথা ফ্রয়েড বলেছেন। তাঁর ভাষায় :

> The second class of instincts was not so easy to define; in the end we came to recognize sadism as its representative. As a result of theoretical considerations, supported by biology, we assumed the existence of a death-instinct, the task of which is to lead organic matter back into the inorganic state.[৮]

এই জীবনবিরোধী প্রবৃত্তির ফলে একাকিত্বই হয়ে ওঠে সনাতনের একমাত্র আরাধ্য। যে-কারণে একমাত্র কন্যাকেও সে বিয়ে দিয়ে দ্রুত শ্বশুরালয়ে প্রেরণে উদ্যোগী হয়। পরিতাপক্লিষ্ট চিত্তদাহ থেকে চিরমুক্তিলাভের মতো সাহসী সিদ্ধান্তগ্রহণে অক্ষমতার ফলে সনাতন স্বাভাবিকমৃত্যুর জন্যই প্রতীক্ষা করে। তাই চাকরি-পরবর্তী অবসরজীবনে আসক্তিযুক্ত ব্যয়ের কথা ভেবে সনাতন অর্থ জমায়। ফলে কন্যার বিয়েতে সে কার্পণ্য করে। পরিণামে শ্বশুরগৃহে তার কন্যা নিপীড়নের সম্মুখীন হলেও সনাতন থাকে নির্বিকার। এ-ব্যাপারে তার অদ্ভুত, আত্মপ্রবোধমূলক

ও কৌতুকপ্রদ যুক্তির বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য : 'প্রথমে যে বৌ দুঃখ পায় পরে তার সুখ নির্ঘাৎ।' (৩।।৪৩৭)। স্ত্রীর প্রতি অধর্মাচরণের জন্য নিঃসঙ্গ পরিবেশে আক্ষেপ, মদ্যাসক্তি প্রভৃতির মধ্যেই সনাতন এমন পরমশান্তির সন্ধানী হয় যে, তার দ্বিতল অট্টালিকায় এসে কন্যাজামাতার একত্রবাসের প্রস্তাব সে একাধিকবার প্রত্যাখ্যান করে। এ-প্রস্তাবে তার সম্মতি মেলে তখন, যখন অতিরিক্ত মদ্যপানের পরিণতিতে তার দৃষ্টিশক্তি ও জমাকৃত অর্থ নিঃশেষিত।

অতঃপর কন্যাজামাতার সংসারপরিবেষ্টিত অন্ধজীবনে সনাতনের স্বার্থদুষ্ট আচরণের অস্বাভাবিকত্ব অব্যাহতই থাকে। পূর্ববর্তী-নির্যাতনের প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে কন্যার অসুস্থ শাশুড়ির হাতমাড়ানো, মাথাফাটানো, চোখ খোঁচানো, নিজকন্যার পরিবর্তে কন্যার আশ্রিতা ননদের প্রতি মমতা প্রকাশ ও সেই সূত্রে সেবালাভ, বিভিন্ন উপলক্ষে কন্যাজামাতাকে উপদেশদান, গৃহচ্যুতির হুমকি দিয়ে তাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় প্রভৃতি সনাতনের নবতর জীবনের নানা অভিব্যক্তিময় প্রান্ত। জামাতার প্রতি উপদেশপ্রদানের ক্ষেত্রে সনাতন একপ্রকার অভিজ্ঞতাপুষ্ট, বিবেকশুদ্ধ ও নীতিনিষ্ঠ মনের পরিচয় দেয়। সে বলে,

> নিজের দোষ দেখতে শেখো, গিরিজা নিজের দোষ স্বীকার করতে শেখো। শিখে অনুতাপ কর। অনুতাপ আরম্ভ করলেই দেখবে জীবন আর নিশার স্বপন নয়, বড় মজাদার। যে অনুতাপের জ্বালায় জ্বলে না তার জীবনটাই বৃথা। ... আমি অন্ধ মানুষ আমি নিজের দোষ দেখতে পাই, তুমি কেন পাওনা বাপু? (৩।।৪৪৭)

সনাতনের এ-উক্তিটি ব্যঞ্জনাদীপ্ত ও অর্থ-অলংকারময়। নিজ আচরণের অসংগতি কিংবা ত্রুটি-বিচ্যুতি শনাক্তকরণের জন্য দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতার চেয়েও প্রয়োজন একটি বিবেচক আত্মবিশ্লেষণক্ষম মনের—এ-সত্যটি এখানে দৃঢ়ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। গিরিজার বোন আনু বিষভক্ষণে মৃত্যু-ইচ্ছা ব্যক্ত করলে, এ-পর্বে, সনাতন অত্যন্ত বিচলিতবোধ করে। আতঙ্কতাড়িত কণ্ঠে সে আনুকে আত্মহত্যা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানায় : 'না আনু না, কখনো বিষ খেয়ে মরো না মা, কক্ষনো নয়। এমনিও মোরো না, মরতে কি আছে? তুমি একা মরলে একজন দু'জন চারজন কতজনকে জ্যান্ত মেরে রেখে যাবে তার কি ঠিক আছে।' (৩।।৪৪৯)। স্ত্রীর মৃত্যুজনিত নির্মম অন্তর্জ্বালা, বিষাদময়তা, শূন্যতার হাহাকার প্রভৃতি সবকিছু যেন একত্রে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় সনাতনের এই ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে। সনাতনের মনোজগতের আর-একটি প্রান্ত উজ্জ্বলতা লাভ করে গল্পের শেষে। কন্যা মোহিনীর অশ্রুপাত শেষপর্যন্ত সনাতনের চিত্তকে দ্রবীভূত করলে কন্যাকে সে স্নেহপাশে আবদ্ধ করে; কিন্তু তার কণ্ঠহার কিংবা কাকনের স্পর্শে সনাতনের সিক্তমন, স্ত্রীর কথা ভেবে, দ্রুত কাঠিন্য অর্জন করে : 'গয়নার শোকে

যে স্বামী সন্তানকে ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গিয়াছিল তার মেয়ে কত গয়না পরিয়াছে দ্যাখো। নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে।' (৩।।৪৫১) সনাতনের শ্মশানবৈরাগ্যক্লিষ্ট মনে হতাশা, এর ফলে, আরও বৃদ্ধি পায়। গল্পশেষে আমরা দেখতে পাই, এতকাল যাবৎ সযত্নে রক্ষিত দিন-রাতের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে সনাতন ওই মুহূর্তেই তার আসক্তির মধ্যে আশ্রয় নেয়।

পাপবোধতাড়িত সনাতনের জীবনাচরণগুলো বিশ্লেষণ করলে তার অসুস্থতা অস্বাভাবিকতা যেমন সুস্পষ্ট হয়, তেমনি এর মধ্য দিয়ে তার মনোগত বিকারগ্রস্ততারও সন্ধান মেলে। তবে এ-নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। 'স্ত্রীর জন্য সনাতনের চেতনায় নানারকম বিকার দেখা দেয়'[৯]— নিতাই বসুর এ-মন্তব্যকে 'ভুল সিদ্ধান্ত' হিসেবে আখ্যায়িত করে সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য এ-গল্পে 'তীক্ষ্ণ ঝাঁঝাল সামাজিক গন্ধ' এবং (মানিকের) 'মার্কসীয় চেতনার প্রস্তুতিপর্বের প্রমাণ'[১০] পেয়েছেন। সমাজবাস্তবতার প্রতিফলন, নিঃসন্দেহে, এ-গল্পের এক উল্লেখযোগ্য দিক; কিন্তু এ সত্যও অনস্বীকার্য যে, এ-গল্পে মানিক সনাতনের মনোজাগতিক জটিলতার উন্মোচনকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এই জটিলতার মধ্যে রয়েছে সনাতনের বিকারপ্রবণতার সূত্রসমষ্টি। নিতাই বসু সনাতনের চেতনাগত এই বিকারের কথাই উল্লেখ করেছেন, সমগ্র গল্পটি 'মনোবিকারের গল্প' বলে আখ্যায়িত করেন নি। প্রবল ভালোবাসার মধ্যেও প্রয়োজনতাড়িত ভুল সিদ্ধান্ত কী বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে এবং সেই সূত্রে একটি সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন ভারসাম্য হারিয়ে কেমন অধঃপতনমুখী হয়— তার দৃষ্টান্ত সনাতনের জীবনবিশ্লেষণসূত্রে মানিক এ-গল্পে উপস্থিত করেছেন।

সনাতনের অসুস্থ রোগগ্রস্ত মনের সমীক্ষণসূত্রে মানিক সমাজজীবনের কিছু বাস্তবচিত্রও প্রসঙ্গক্রমে অঙ্কন করেছেন। মধ্যবিত্তমানসের স্বার্থান্ধ জীবনপরিবেশ মানবহৃদয়কে কিভাবে স্নেহশূন্য সহানুভূতিশূন্য নির্দয় ও বিবেকহীন করে তোলে— অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে মানিক তার মর্মোদঘাটন করেছেন। গল্পের এ-দিকটি সম্পর্কে সমালোচকদের বিশ্লেষণও সত্যের নিকটবর্তী :

> সরোজমোহন মিত্র : আসলে সনাতন অন্ধ নয়, এ সংসারে সকলেই নিজের স্বার্থবোধের দ্বারা অন্ধ।[১১] (১৯৭০)
>
> গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : অন্ধ গল্পে মেয়ে ও জামাইয়ের সঙ্গে সনাতনের সম্পর্কের অসামঞ্জস্যের ছবির সঙ্গে অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িয়ে আছে আরেকটি সত্য, সেটি হলো মধ্যবিত্ত মানুষের মনে হৃদয়-সম্পর্ককে ছাড়িয়ে হীন অর্থলোভ ও স্বার্থবুদ্ধির প্রাধান্য।[১২] (১৯৮৭)

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য : সনাতন অন্ধ, কিন্তু শরীরের ভেতরে আরেক যে সনাতন বাস করে সে অন্ধ নয়। আমরা বুঝতে পারি গল্পের কথা, মান-অভিমান ক্ষুদ্র স্বার্থ মানুষকে অন্ধ করে রাখে এবং সমাজের বাস্তবতা মানুষকে জাগিয়ে রাখে।[১৩] (১৯৯০)

একমাত্র সন্তান হয়েও মোহিনী বৃদ্ধ ও অন্ধ সনাতনের প্রতি যে রূঢ় আচরণ করে— তার সন্দেশ লুকিয়ে রাখা, সেবাপ্রদানে অনীহা কিংবা অর্থপ্রদানে কার্পণ্য প্রভৃতির মাধ্যমে— মনে রাখা প্রয়োজন, তা কন্যার প্রতি পিতার সমগ্র বিরূপ আচরণেরই প্রতিদান। অন্যদিকে নববধূ হিসেবে মোহিনীর প্রতি শ্বশুরালয়ের যে লাঞ্ছনা তার পেছনে যেমন সনাতনের পক্ষ থেকে অপর্যাপ্ত যৌতুকদানের প্রসঙ্গটি ক্রিয়াশীল, তেমনি মোহিনীর শাশুড়ির ওপর সনাতনের যে-কৌশলী আক্রমণ তার পেছনেও রয়েছে প্রতিশোধগ্রহণের স্পৃহা— অর্থাৎ মোহিনীর প্রতি তার শাশুড়ির দীর্ঘদিনের নিপীড়নের অতীত যেন এর মধ্য দিয়ে বাঙময় হয়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীস্তরের মানুষগুলোর স্বার্থতাড়িত আচরণসমূহকে মানিক, এ-গল্পে, এভাবে কার্যকারণ শৃঙ্খলা দান করেছেন।

**মাথার রহস্য**

*মাথার রহস্য* (প্রাপৈতিহাসিক) গল্পের প্রথম বাক্যটি এরকম : 'শেষ বয়সে একসঙ্গে থোক দুই হাজার টাকা হারানোর পর পতিতপাবনের মাথাটা একটু খারাপ হইয়া গিয়াছিল।' (৩।৪৬৭) মানিকের বর্ণনায়, অবসরপ্রাপ্ত জীবনে 'মাসে মাসে সাঁইত্রিশ টাকা পেন্সন আর জীবনবীমার ঐ দুই হাজার টাকা ছাড়া পতিতপাবনের আর কিছুই ছিল না। টাকা তো নয়, ঘামের রক্তের চেয়েও বেশী।' (৩।৪৬৭) পতিতপাবনের নিকট টাকার এত অধিক গুরুত্বের কারণ, সংসারে আর কোনো উপার্জনশীল ব্যক্তির অনুপস্থিতি। একটি বেকার বিবাহিত পুত্র, একটি কলেজছাত্র, একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা এবং স্ত্রীসহ পতিতপাবনের সংসার কম ব্যয়বহুল নয়। ফলে সারাজীবনের সঞ্চয়কৃত অর্থ হারিয়ে এই বৃদ্ধবয়সে তার মনোগত ভারসাম্যে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে— সেটাই স্বাভাবিক।

পতিতপাবনের বিপর্যস্ত মানসিকতার ক্রম-উন্মোচনে এ-গল্প তাৎপর্যদীপ্ত। কোথাও পুঁতে রাখার কথা বলে পতিতপাবন প্রথমে টাকা-হারানোর তথ্য অস্বীকার করে। এ-নিয়ে সকলের দুশ্চিন্তা লক্ষ করে সে ক্ষুব্ধ ও ক্রোধান্বিত হয়। তার মতে, ওই টাকা হস্তগত হবার অভিপ্রায় থেকেই সকলের এই দুর্ভাবনা। বিবাহযোগ্যা কন্যার বিয়ে-সম্পর্কিত উৎকণ্ঠা প্রসঙ্গে পতিতপাবনের বক্তব্য : মেয়েকে তো সে দুবছর পূর্বেই বিয়ে দিয়েছে। তাহলে নতুন করে তাকে নিঃস্বকরণের অভিপ্রায়

থেকেই কি মেয়ে পুনর্বার বিয়ের কথা বলছে? অতএব কন্যাকে ডেকে সে এরূপ 'মতলব' পরিহারের জন্য ধমকায়। তবে এসব অস্বাভাবিকত্ব বাদ দিলে পতিতপাবনের আচরণে সুস্থ-স্বাভাবিকতাই লক্ষণীয়। যেমন : মাসের একতারিখে পেনশন তুলে-আনা, সময়মতো স্নানাহার, সংসারের স্বাভাবিক গতিকে বাধাগ্রস্ত না-করা, নিজের বিনিদ্র রাত্রিযাপন দ্বারা অন্যের ঘুমের ব্যাঘাত না-ঘটানো প্রভৃতি পরিবেশ-সতর্কতা লক্ষ করে তার বিকারগ্রস্ত অসুস্থ মনের প্রকৃতি নির্ধারণ, বাহ্যিক দৃষ্টিতে, দুঃসাধ্য। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দ্বারস্থ হলে আমরা পতিতপাবনের এই ভারসাম্যহীনতাকে হিস্টিরিয়া রোগগ্রস্ততার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় : শারীরিক অসুস্থতার ভান করলে বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে সে সন্তোষজনকভাবে সংগতিবিধান করতে পারবে কিংবা বর্তমানের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পারবে এই ধরনের একটা ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিস্টিরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তি অস্বাভাবিক আচরণ করে।[১৪]

স্মরণীয় যে, মানিক কেবল পতিতপাবনের মনঃপীড়ার চিত্রাঙ্কনের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। পিতার বিকারের চিকিৎসায় তার প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ বিবেচক পুত্র যাদব নিজেকে উৎসর্গ করে কিভাবে নানাবিধ অস্বাভাবিক আচরণের মধ্য দিয়ে নিজেই ক্রমশ ওই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে— তার কাহিনীনির্মাণ করে মানিক এ-গল্পকে যেমন মহিমান্বিত করেছেন, তেমনি এ-জাতীয় মনোরোগের বৈশিষ্ট্যকেও ভিন্নতর তাৎপর্য দান করেছেন। শিল্পী হিসেবে এখানেই মানিকের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। যে-পরিমাণ অর্থ হারিয়ে গেছে ঠিক সেই পরিমাণ অর্থসংগ্রহ করে পতিতপাবনের হাতে দিতে পারলে তার রোগমুক্তি সম্ভব— এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে যাদব অস্বাভাবিক পরিশ্রমের বিনিময়ে কলেজের পরীক্ষায় ভালো ফলাফল ও সেই সূত্রে নিজেকে সুপাত্র হিসেবে তৈরি করে। অতঃপর যৌতুকের বিনিময়ে এক কুরূপা কন্যাকে সে বিয়ে করে। বিয়ের অনুষ্ঠানশেষে যাদব যখন তার পিতাকে 'পুঁতে রাখা' অর্থের সন্ধান দেয়, তখন পতিতপাবনের সুস্থ-স্বাভাবিক আচরণ যাদবকে করে তোলে অস্বাভাবিক, বিকারগ্রস্ত। পিতা ও পুত্রের রোগগ্রস্ততার কারণ ডাক্তারের মুখ থেকে, এ-গল্পে একই ভাষায় দুস্থানে, মানিক উপস্থাপন করেছেন। বক্তব্যটি নিম্নরূপ :

> হঠাৎ মনে আঘাত লাগিয়া যে পাগলামি আসে, সেটা সাধারণতঃ স্থায়ী হয় না, আস্তে আস্তে চলিয়া যায়। এমন অনেক দেখা গিয়াছে যে, একবার একটা আঘাতে হঠাৎ যে বদ্ধ পাগল হইয়া গিয়াছে, আর একবার অন্য একটা আঘাতে তেমনি হঠাৎ সে হইয়া উঠিয়াছে সুস্থ। যাদব [অন্যত্র পতিতপাবন] বুঝি সেই পাগলের গল্প জানে না। সিঁড়িতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া মাথা ফাটিয়া যে অজ্ঞান হইয়া ছিল তিন দিন, তারপর যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, একেবারে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ!

> বড় আশ্চর্য জিনিস মানুষের মাথাটা, বড় খাপছাড়া, বড় রহস্যময়। কিসে যে কখন কি হয়, কারো তা বলার ক্ষমতা নাই। (৩।।৪৭১, ৪৭৬)

মানিকের এই শেষোক্তিটি যতটা আবেগদীপ্ত ততটা যুক্তিনির্ভর নয়। কেননা আমরা জানি, মানুষের মনোগত আচরণের নিয়মাবলি অনুসন্ধানে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে অগ্রগতিও কম নয়। ফ্রয়েড ও তার সহকর্মীরা মনোব্যাধির কারণ ও তার প্রতিকারের জন্য যেসব ব্যবস্থার কথা বলেছেন, তা এক্ষেত্রে যুগান্তকারী বিপ্লবসাধন করেছে। ফ্রয়েড লিবিডোর শৈশবকালীন সংবন্ধনকে মনোব্যাধির পরোক্ষ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, প্রত্যাবর্তিত লিবিডোকে তার শৈশবকালীন সংবন্ধনস্থল থেকে মুক্ত করাই মনোব্যাধি নিরাময়ের একমাত্র উপায়। সুতরাং ফ্রয়েডীয় ধারণা অনুযায়ী, প্রত্যক্ষ হোক পরোক্ষ হোক সকল মনোব্যাধির পেছনেই লিবিডোর ভূমিকা অবশ্যম্ভাবী। তবে ফ্রয়েডের সহকর্মীদের মধ্যে এ-নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি হয়। তাঁর এককালীন সহকর্মী সি.জি. ইউঙের মতে, মনোব্যাধি সবসময় অবদমিত যৌনকামনা থেকে জন্মায় না। ব্যক্তির বর্তমান জীবনযাত্রায় সহনাতীত কোনো আঘাতমূলক অভিজ্ঞতা বা কোনো একান্ত জটিল সমস্যার চাপ তার স্বাভাবিক সংগতিবিধানকে নষ্ট করে দিলে মনোব্যাধির সৃষ্টি হয়। এ সময় তার মধ্যে শৈশবকালীন আচরণধারা পুনরায় জাগ্রত হলেও সংগতিবিধানের শৈশবকালীন প্রয়াসগুলি বর্তমান জীবনধারায় নিতান্ত অপর্যাপ্ত বিবেচিত হয়। সে-কারণে ইউঙের মতে, যে প্রত্যক্ষ কারণ থেকে মনোব্যাধির উদ্ভব তা দূর করাই হলো নিরাময়ের একমাত্র উপায়।[১৫] পতিতপাবনের মনোবিশ্লেষণ করলে আমরা ইউঙের মতবাদের যাথার্থ্য লক্ষ করবো। বহির্গত কোনো চাপ কোনো ব্যক্তিমনে যখন অসহনীয় পীড়নের সৃষ্টি করে কিংবা, বলা যায়, বহিরারোপিত কোনো সমস্যার সমাধানে যখন ব্যক্তিমানস অসামর্থ্য হয়ে ওঠে, তখনই তার মানসিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়। কোনোভাবে যদি ওই চাপের অপসারণ ঘটানো যায় কিংবা সমস্যাটির সমাধান দেয়া যায় তাহলেই ব্যক্তির মনোগত ভারসাম্য পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে পারে।

মানিক এ-গল্পে পতিতপাবন ও যাদবের মনোরহস্য উন্মোচনসূত্রে তাদের সমস্যাসংকুল পরিবারজীবনের এক নির্মম বাস্তবতাকেও চিত্রিত করেছেন। অর্থাভাবে যেখানে কন্যার বিয়ে স্থগিত থাকে, পুত্রের পত্রিকা-প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়, অর্থের জন্য বরণ করতে হয় কুরূপা স্ত্রীকে, পিতার দারিদ্র্যের কারণে পিতৃব্যের সংসারেও জোটে নানারূপ লাঞ্ছনা প্রভৃতি খণ্ড-বিচ্ছিন্ন চিত্রের মধ্য দিয়েই তেমন একটি অসচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের যন্ত্রণাদায়ক ছবি পূর্ণতা অর্জন করেছে।

**টিকটিকি**

মানিকের মনঃসমীক্ষণমূলক গল্পগুলোর মধ্যে *টিকটিকি* (মিহি ও মোটা কাহিনী) বিশেষ তাৎপর্যবাহী। সকালে স্ত্রীর মুখ থেকে মৃত্যু-প্রসঙ্গ উত্থাপনের সময় টিকটিকির সম্মতিসূচক ডাক এবং ওইদিনই সন্ধ্যায় তার মৃত্যুর ঘটনা জ্যোতিষার্ণবের মনে টিকটিকি-সংস্কার দৃঢ়মূল করে দেয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রচর্চার মাধ্যমে মানুষের 'অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যার নখদর্পণে', স্ত্রীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, সেই ব্যক্তিই এ দিকে নিজের অজ্ঞতা ও অন্তঃসারশূন্যতাকে যেমন প্রকটভাবে প্রত্যক্ষ করে, অন্যদিকে তেমনি টিকটিকির অভ্রান্ত ডাকের সঙ্গে মৃত্যুর নিশ্চিত সংযোগ আবিষ্কার করে মনোমধ্যেকার আদিম সংস্কারে সে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মনোজগতে একটি ঘটনার এরূপ দ্বিবিধ অভিঘাতের ফলে জ্যোতিষার্ণবের মধ্যে সঞ্চারিত হয় বিকারগ্রস্ততা।

মানিক জ্যোতিষার্ণব-চরিত্রের মনোবিকার উন্মোচনে নিরাসক্তির পরিচয় দিয়েছেন। 'মা কোথায় গেছে বাবা?'— পুত্রের এই প্রশ্নের উত্তরে 'স্বর্গে'র কথা বলে জ্যোতিষার্ণব টিকটিকির সম্মতি না-পেয়ে হতাশ হয়। ফলে স্ত্রীর স্বর্গগমন সম্বন্ধে মনে তার সন্দেহ জাগে। মনে পড়ে, স্ত্রীর সঙ্গে তার সামাজিক বা ধর্মীয় রীতিতে বিবাহের পরিবর্তে গান্ধর্ববিবাহের কথা। দ্বিতীয়বারে একই প্রশ্নের উত্তরে সে নরকের কথা উল্লেখ করে এবং একই ধরনের প্রতীক্ষায় থেকে হতাশ হয়। অতএব পুত্রের কাছে সে নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে : 'তোর মা এখনো নরকে যায়নি, ... যাবে, ভবিষ্যতে যাবে।' (৪।।২৪৬)। এবারও জ্যোতিষার্ণব কান পেতে থাকে এবং অন্য অনেক শব্দের সঙ্গে টিকটিকির কণ্ঠও শুনতে পায়। জ্যোতিষার্ণবের মনে টিকটিকি-সংক্রান্ত বিকারের অভিব্যক্তি ঘটে এভাবে। অতঃপর নিজের সকল বক্তব্যের সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য 'ত্রিকালদর্শী' টিকটিকির আহ্বানের অপেক্ষা করা তার গভীরতর সংস্কার ও স্বভাবে পরিণত হয়। ব্যবসায়িক পরিবেশেও সে টিকটিকির অভ্রান্ত উচ্চারণের কথা প্রকাশ করে। ছমাস পরে নতুন বিয়ে উপলক্ষে গৃহের টিকটিকি-নিধন, নববধূর মুখ থেকে মৃত্যু-প্রসঙ্গ যাতে কখনও উচ্চারিত না-হয় সে-ব্যাপারে সতর্কতা, নববধূর কিশোরবন্ধু মানিককে দিয়ে গৃহের নতুন টিকটিকিগুলোর হত্যাসাধন প্রভৃতি জ্যোতিষার্ণবের ব্যাধিগ্রস্ত মনেরই বহিঃপ্রকাশ।

প্রথম স্ত্রীর আকস্মিক ও নাটকীয় মৃত্যুর পরে জ্যোতিষার্ণবের মনঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে আমাদের কাছে তার বিকারগ্রস্ততার চিত্রটি স্পষ্ট হয়। মনের অচেতন স্তরে বংশপরম্পরায় লালিত এক আদিম কুসংস্কারাচ্ছন্নতাই তার মানসিক ভারসাম্যচ্যুতির কারণ। নির্জ্ঞান মনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী ইউঙ বলেছেন, প্রাচীন পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা এমন

কতকগুলো প্রবৃত্তি বা প্রবণতা লাভ করি যার নাম দেয়া যায় জাতিগত বা পূর্বপুরুষীয় অচেতন (Racial or Ancestral Unconcious)। এ-ধরনের নানাবিধ ধারণা, সংস্কার, ইচ্ছা ও বিশ্বাস আদিম প্রজন্মের কাছ থেকে ক্রমবিবর্তনের ধারা বেয়ে এ-যুগের মানবমনে সঞ্চারিত হয়। মানবদেহে বিবর্তনের আদিস্তরে বিভিন্ন চিহ্ন যেমন আজও বর্তমান, তেমনি মনের নির্জ্ঞানস্তরে মানুষ আজও বহন করছে আদিলগ্নের মনোগত বৈশিষ্ট্যের নানাবিধ সাক্ষ্য। ইউঙের ভাষায় :

> Just as the human body connects us with the mammals and displays numerous relics of earlier evolutionary stages going back even to the reptilian age, so the human psyche is likewise a product of evolution which, when followed up to its origins, shows countless archaic traits.[১৬]

এসব উপাদানের রূপ ও স্বরূপ এমন অদ্ভুত অসামাজিক ও বীভৎস যে, বর্তমান বিজ্ঞানমনস্ক জীবনধারার সঙ্গে তা মানানসই নয়। ফলে মানবমনের সচেতন স্তর থেকে নির্বাসিত হয়ে এসবের বসতি হয় অচেতন স্তরে। ইউঙ এর আরেক নাম দিয়েছেন আর্কিটাইপ (archetype)।[১৭] বংশানুক্রমিক প্রক্রিয়ায় মানবপ্রবাহে যুগ-যুগের সংস্কার-বিশ্বাসের যে-গতিশীলতা, নতুনকালের অভিঘাতে তা সংকুচিত রূপ নিয়ে মনোকাঠামোর অন্তর্তলে সুপ্তাবস্থায় থাকলেও কোনো ঘটনাঘাতে তার অভিব্যক্তি ঘটে। যদিও এই আর্কিটাইপের বসবাস কেবল ব্যক্তিচৈতন্যে নয়, জাতীয় বা সমষ্টিচৈতন্যে, তবু সুপ্তিভঙ্গশেষে কোনো ব্যক্তিচৈতন্যে যখন তার উত্থান ঘটে— বিজ্ঞানধর্মী বর্তমানে সে বেমানান বলেই— তখন ওই ব্যক্তিচৈতন্যের ভারসাম্যকে সে বিপর্যস্ত করে দেয়। টিকটিকির ত্রিকালদর্শিতা-সম্পর্কিত কুসংস্কারের যে আর্কিটাইপ আমাদের জাতীয় চৈতন্যে প্রোথিত, কাকতালীয় ঘটনাসহযোগে জ্যোতিষার্ণবের চেতনালোকে সেই অন্ধবিশ্বাসের পক্ষসঞ্চালন তার মনোব্যাকরণের নিয়মনীতিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়।

এ-গল্পে জ্যোতিষার্ণবের মনোগত তত্ত্বানুসন্ধানসূত্রে মানিক সম্পূর্ণ বিজ্ঞানশুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নির্মম আঘাত হেনেছেন। টিকটিকি-সম্পর্কিত প্রচলিত সংস্কার যে ভিত্তিহীন, টিকটিকির সরব হওয়ার বিজ্ঞাননির্ভর ব্যাখ্যাপ্রদানসূত্রে মানিক গল্পমধ্যে তা উল্লেখ করেছেন। তার সৃষ্ট চরিত্র সংস্কারপ্রাবল্যে আত্মহারা হলেও এ-ব্যাপারে স্রষ্টা হিসেবে তিনি যে পুরোপুরিভাবে মোহমুক্ত, সে-বিষয়টি মানিক গোপন করেন নি। যেমন :

> অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ যার নখদর্পণে, সেও বুঝিতে পারে না ব্যাপারখানা কি। তার ছেলেমেয়ের মা মরণের কথা বলবে মনে করার আগেই মাথার উপর কড়িকাঠে যে টিকটিকিটার লেজ নড়তে আরম্ভ করেছিল, তার ছেলেমেয়ের মা মরণের কথা বলার পরে সেই টিকটিকিটাই যে আরেকটা টিকটিকিকে তার ছেলেমেয়ের মা হতে ডেকেছে, এইটুকু কেবল জ্যোতিষার্ণব জানে না। (৪।। ২৪৪)

স্বীকার্য যে, কুসংস্কারাচ্ছন্নতার চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে মানিকের নিরাসক্ত শিল্পচেতনা সর্বদা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। আমরা স্মরণ করতে পারি, *পুতুলনাচের ইতিকথা* (১৯৩৬) উপন্যাসের যাদব ও তার স্ত্রীর স্বঘোষিত মৃত্যুর কথা। সিদ্ধপুরুষ হিসেবে নিজেকে অমর করে রাখার আন্তর্গরজে যাদব স্ত্রীসহ আফিমপানে আত্মহত্যা করে— এ-তথ্যটি উপন্যাসের রচয়িতা মানিক ও কেন্দ্রীয় চরিত্র শশী ডাক্তার ছাড়া আর কেউ জানে না। অজ্ঞানতার অন্ধকারে থেকে মানুষের মনে মিথ্যার প্রতিষ্ঠা কিভাবে দৃঢ়মূল হয়— সেই কাহিনীচিত্রই মানিক নিপুণহাতে দৃশ্যবদ্ধ করেন। কাহিনীমধ্যে তিনি মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন করেন না ঠিক, কিন্তু পাঠককে সত্যের মুখোমুখি করতেও ভোলেন না। উপরিউক্ত উদ্ধৃতির প্রথম বাক্যাংশটির মধ্যে মানিক তীব্র তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও ব্যঙ্গের সুর সংযোজন করেছেন। জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চার মাধ্যমে যিনি মানুষের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সবজান্তা বলে দাবি করেন, আসলে তিনি যে এর কিছুই জানেন না— এমনকি সাধারণ একটি প্রাণীর আচরণ সম্পর্কেও তার অজ্ঞতা সীমাহীন— সেই বিষয়টিকেই মানিক এখানে ঔজ্জ্বল্যদান করেছেন। উপরন্তু এ-গল্পের কাহিনীবিন্যাসের মধ্য দিয়ে জ্যোতিষীদের ব্যবসাগত প্রতারণা, জ্ঞানের অন্তঃসারশূন্যতা, মিথ্যাচার ও ভণ্ডামির মুখোশও উন্মোচিত হয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে সি.জি. ইউঙের বক্তব্য প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য : Astrology and other methods of divination may undoubtedly be called the science of antiquity.[১৮] মক্কেলদের সামনে স্ত্রীর মৃত্যু-সম্পর্কিত নিজ পাণ্ডিত্য নিয়ে যে-গল্প ফাঁদে জ্যোতিষার্ণব তাতে তার শঠতা, প্রবঞ্চনা ও কপটস্বভাবের পরিচয় অতি স্পষ্ট। মানিকের সৃষ্টিকুশলতায় জ্যোতিষার্ণব কেবল ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ না-থেকে হয়ে উঠেছে একটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি; আর তার পরিণতিতে ওই সম্প্রদায়টি ব্যবসায়িক অসততাই সামগ্রিকভাবে তার আচরণের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

মনোব্যাধি বা কুসংস্কারাচ্ছন্নতার সংক্রামকতা উত্থাপন প্রসঙ্গে উজ্জ্বল হয়েছে এ-গল্পের আরেক প্রান্ত। জ্যোতিষার্ণবের দ্বিতীয় স্ত্রী রেবতীর স্নেহধন্য কিশোর মানিক জ্যোতিষার্ণবের কাছ থেকে ভূতের গল্প শোনার কৌতূহলে তার-দেয়া শর্ত অনুযায়ী টিকটিকিনিধনে প্রবৃত্ত হয়। এ-প্রক্রিয়ায় একটি টিকটিকির চোখের পাশে

দুটি আলপিন বিধে দুটি রক্তের ফোটা জমলে তাকে নতুন দুটি চোখ বলে ভ্রম হয়। এ-দৃশ্য দেখে জ্যোতিষার্ণব বলে : '... টিকটিকিকে চারচোখো করে দিলে! তোমাকেও চারচোখো হতে হবে মানিক।' (৪।।২৪৯-৫০)। অতঃপর লেখকের ভাষায় : 'স্কুলে বোর্ডের লেখা দেখতে না পাওয়ায় এক মাসের মধ্যে আমাকে চশমা নিতে হয়। চশমা চোখ নয়, কিন্তু বন্ধুরা আমায় চারচোখো বলে কত যে তামাসা করে ঠিক নেই।' (৪।।২৫০)। মনোজগতের গভীরতলাশ্রয়ী অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারজাত যে-ব্যাধি আমরা জ্যোতিষার্ণবের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি, উগ্রভাবে না হলেও, তারই অতি-সূক্ষ্ম সংক্রমণ যেন ঘটছে কিশোর মানিকের মধ্যে। গল্পের কিশোরচরিত্র মানিক হয়ত বিশ্বাস করছে, টিকটিকিনিধন ও তার পরিণতিতে জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী— এ-সবকিছুরই ভূমিকা রয়েছে তার দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের পেছনে। আর এসবের মূলে তো সেই রেবতী— যার সঙ্গে তার সখ্য গড়ে ওঠার কারণেই সে ওই বাসায় যেত। অতএব 'রেবতীর কথা মনে হলেই সেই বাণবিদ্ধ টিকটিকিটার দুটি ধূসর চোখ, তার চোখ দুটির পাশে দুটি ফ্যাকাশে রক্তবিন্দুর ছবি মনে ভেসে আসে, দারুণ বিতৃষ্ণায় আমার মন ভরে যায়। রেবতীর প্রতি বিতৃষ্ণা,— রেবতীর কোন দোষ ছিল না, তবু।' (৪।।২৫০)। বিতৃষ্ণা টিকটিকির প্রতিও; যে-কারণে তিনি বলেন : 'কখনো দেয়ালের টিকটিকি না দেখবার ইচ্ছা হলে আমার চোখ বুঝতে হয় না— চশমাটা খুলে ফেললেই চলে।' (৪।।২৫০)। আসলে গল্পে এ-প্রসঙ্গটির অবতারণা করে মানিক কুসংস্কারকে প্রতিষ্ঠা করতে চান নি; মানুষের মনোগভীরে আদিম বিশ্বাস ও সংস্কারের যে-ফল্গুপ্রবাহ, তা একমন থেকে আরেকমনে কিভাবে সংক্রামিত হয় সেই বিজ্ঞানসত্যটিই তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন মাত্র। সংক্রমণের এ-বিষয়টি আরও স্পষ্টরূপ ধারণ করেছে মানিকের *হলুদ পোড়া* গল্পে।

*টিকটিকি* মানিকের মনোবিশ্লেষণধর্মী গল্পগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রতিনিধিস্থানীয়। বর্তমান সভ্যযুগেও মানবমনের অচেতন-অংশে আদিমানবের অজ্ঞতাতাড়িত কুসংস্কারসমূহ কিভাবে সঞ্চিত হয়ে আছে, তার মর্মোদঘাটনই এ-গল্পকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। অথচ অধিকাংশ সমালোচকের বিশ্লেষণে এ-গল্প থেকেছে উপেক্ষিত; আর যে-কয়জন এ-ব্যাপারে তৎপর হয়েছেন তাদের মূল্যায়নেও উপর্যুক্ত তাৎপর্য প্রতিষ্ঠা পায় নি। কয়েকজন সমালোচকের বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

> নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : লেখকের আত্মস্মৃতিমূলক 'টিকটিকি' উপাদেয় ইঙ্গিতময় গল্প। কিন্তু টিকটিকির সাংকেতিকতার সঙ্গে জ্যোতিষার্ণবের বিচিত্র কমপ্লেক্সের মিশ্রণ যে জটিলতার সৃষ্টি করেছে— তার রূপটাকে আর একটু কম obscure করলেও কোনো ক্ষতি ছিল না; বরং অনূঢ় প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে টিকটিকির

সম্পর্ক ও জ্যোতিষার্ণবের মনে তার প্রতিক্রিয়াজাত fixation, দ্বিতীয়া স্ত্রী রেবতী ও কিশোর উত্তমপুরুষের সম্বন্ধ নিয়ে তার মনোভাব— টিকটিকির 'চারচোখা' হওয়ার মধ্যে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হওয়ার কূট উল্লাস— এগুলিকে আর একটু স্পষ্টরেখ করলে গল্পটি আরো সমৃদ্ধ হত বলেই মনে হয়। তির্যক রীতি এবং ইঙ্গিতময়তা এ যুগের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য সন্দেহ নেই— কিন্তু বহু উচ্চারিত এবং নিত্যকালীন সত্য সাহিত্যের 'সহিতত্ব'কেও একেবারে বিস্মৃত হওয়া কোনো সহৃদয় লেখকেরই উচিত নয়।[১৯] (১৯৫৮)

সরোজমহোন মিত্র : বাচনভঙ্গির তির্যকতায় এবং বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গির জন্য গল্পটি উল্লেখযোগ্য হলেও গল্পের মূল বক্তব্য অস্বচ্ছ। তীক্ষ্ণ শরমুখী ছোটগল্পের কাহিনীশৈলীও শিথিল। তবে টিকটিকির সাহায্যবিহীন জ্যোতিষার্ণবের জ্যোতিষচর্চা উপহসিত হয়েছে। অন্ধ কুসংস্কারকে নির্মম আঘাত করতে মানিকের সুনিপুণ দক্ষতাই এখানে প্রশংসনীয়।[২০] (১৯৭০)

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত : টিকটিকির অতি-সাংকেতিকতা রসহানি ঘটিয়েছে। জ্যোতিষার্ণবের একটি গূঢ় গোপন মন আছে, কিন্তু তার স্বরূপ কি? এ বিষয়ে তিনি নীরব।[২১] (১৯৮১)

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : জ্যোতিষার্ণবের প্রথমা স্ত্রীর মারা যাবার দিনক্ষণ তাঁর জানা ছিল, একথা গল্প করে জ্যোতিষার্ণব অবিশ্বাসী শ্রোতাকে স্তব্ধ করে দেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কিশোরী রেবতীকে বিয়ে করেন। গণনালয়ে দেয়ালের টিকটিকিটা সবসময় নিজেকে প্রকাশ করে রাখে। টিকটিকির ডাকের সঙ্গে মৃত্যু-ইচ্ছার গূঢ় সম্পর্ক তিনি ব্যাখ্যা করেন। সেই তিনি-ই টিকটিকিটা মারার জন্য প্রতিবেশী কিশোরকে উত্তেজিত করেন, পরে তার মনে ভয় ধরিয়ে দেন। টিকটিকি কি প্রথমার স্বর্গে যাবার পথ বন্ধ করেছিল, আর দ্বিতীয়ার পথ খুলে দিয়েছিল? রেবতী আর কিশোরটির সম্পর্ক জ্যোতিষীর মনোভাবের গূঢ়তায় গল্পের শেষ।[২২] (১৯৮২)

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কারের দ্বারা মানিকের শিল্পিচেতনা সমৃদ্ধ ছিল। সে-কারণে ওইসব আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ না-হলে তার রচনার মর্মার্থ ব্যাখ্যা প্রায়শ কঠিন হয়ে পড়ে। *টিকটিকি* গল্পবিশ্লেষণে আমরা বারবার এই দুরূহতার সম্মুখীন হই।

*টিকটিকি* গল্পের সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের *দিবসের শেষে* ও *হাড়* গল্পদ্বয়ের একটি বিষয়ে সাদৃশ্য বর্তমান। কোনো না কোনো চরিত্রের মুখ থেকে উচ্চারিত ভবিষ্যদ্বাণীর অনিবার্য বাস্তবায়ন এ-সকল গল্পের নিকট-সম্পর্কের কারণ। *টিকটিকি* গল্পে জ্যোতিষার্ণবের স্ত্রী যেদিন সকালে মৃত্যু-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন

সেদিনই তার জীবনাবসান ঘটে। *দিবসের শেষে* গল্পে পাঁচু যেদিন সকালে 'আজ আমায় কুমিরে নেবে' বলে প্রচার করে, সেদিনই কুমিরের দ্বারা সে নিহত হয়। *হাড়* গল্পে রসি যেদিন সনাতনকে 'মাছই যেন আজই তোকে মারে' বলে অভিসম্পাত দেয়, সেদিনই মাছের হাড় গলায় বিঁধে সনাতনের মৃত্যু ঘটে। কাহিনীগত এই সাদৃশ্যের অন্তরালে গল্পের পরিণাম ও পরিবেশ বিবেচনা করলে দুই লেখকের মধ্যেকার পার্থক্যরেখাটি স্পষ্ট হয়। মানিকের বিজ্ঞানদৃষ্টির স্বচ্ছতা এক্ষেত্রে অনুধাবনীয়। তিনি তাঁর গল্পে ঘটনার কাকতালীয় যোগাযোগ, অথচ তা নিয়ে মানুষের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ও অজ্ঞতা সম্পর্কে পাঠককে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেন; কোনো দ্বিধার মধ্যে রাখেন না। অন্যদিকে জগদীশ গুপ্তের গল্প পড়ে পাঠক সংশয়মুক্ত হয় না— অমোঘ নিয়তি, যাদুবিশ্বাস, অলৌকিকতা প্রভৃতির অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না।

**হলুদ পোড়া**

মানিকের শ্রেষ্ঠ গল্পতালিকায় *হলুদ পোড়া* (হলুদ পোড়া)র অবস্থান বিশিষ্ট। গ্রামের অশিক্ষিত মানসে অজ্ঞানতার যে-অন্ধকার, নানাবিধ কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের যে-আচ্ছন্নতা তার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে এ-গল্পে। এই কূপমণ্ডুকতার গাঢ় গভীর তিমিরে বিজ্ঞানচেতনার সকল আলো যে হারিয়ে যায়— সেই সত্যও উদঘাটন করেছেন মানিক। গ্রামীণ জীবনে ধর্মান্ধতা, ভ্রান্তবিশ্বাস ও গোঁড়ামির ব্যাপ্তি ও শক্তিকে লেখক প্রত্যক্ষ করেছেন একান্তভাবে বাস্তববাদী শিল্পীর নিরাবেগ দৃষ্টি সহযোগে। মাত্র তিনদিনের ব্যবধানে একই গ্রামে দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ওই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল— সামাজিক বা প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়া নয়, কেবল মানসিক প্রতিক্রিয়া— সেটা দেখানোই ছিল মানিকের লক্ষ্য। আর তার মধ্য দিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন গ্রামজীবনের অজ্ঞতাপুষ্ট মনোভূমিতে দৃঢ়মূল হয়ে থাকা নানা অন্ধসংস্কার, ভ্রান্তধারণা, অতিলৌকিক উপাদান প্রভৃতির বৈচিত্র্য এবং তার ধ্বংসাত্মক ও অমানবিক প্রবৃত্তিকে। এ-সূত্রেই উদঘাটিত হয়েছে গ্রামীণ বাস্তবতার আরেকটি নির্মম ও কুৎসিত বৈশিষ্ট্য। তা হলো : অপপ্রচার, গুজব ও নারীঘটিত কলঙ্করটনার ক্ষেত্রে অতি উৎসাহ বা আনন্দলাভ; এসবের প্রতি গ্রামবাসীর গুরুত্বপ্রদান; এবং এভাবে মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে কোনো সুস্থমনকেও অসুস্থ করে তোলা।

স্বল্প ব্যবধানে সংঘটিত দুটি অপমৃত্যুর ঘটনা গ্রামবাসীর মনে জন্ম দেয় নানা সন্দেহ সংশয় বিস্ময় কৌতূহল— এমন অনেক কিছু। এই রহস্যময় মৃত্যুর

অব্যবহিত কারণ অনুদঘাটিত থাকায় জল্পনা-কল্পনা ও রটনার ফানুসই কেবল স্ফীত হয়। এর আরও কারণ : নিহতের একজন পুরুষ, অন্যজন নারী; একজন মাঝবয়সী মদ্দ জোয়ান, অন্যজন ষোল-সতের বছরের যুবতী। নিহত বলাই চক্রবর্তীর মাথায় ছিল প্রচুর আঘাতের চিহ্ন; শুভ্রাকে মারা হয়েছিল গলা টিপে। বলাই চক্রবর্তীর মৃত্যু দশগ্রামের মানুষের প্রত্যাশা ছিল; কারো ছিল একান্তভাবে কাম্য। অন্যদিকে সাতমাসের অন্তঃসত্ত্বা শুভ্রা ছিল রোগা ভীরু নিরীহ ও নির্বিরোধ জীবনে অভ্যস্ত। কাহিনীসাক্ষ্য থেকে অনুমান করা যায়, বলাই চক্রবর্তীর জীবন ছিল অসততাপূর্ণ, অত্যাচারপ্রবণ ও প্রতারক স্বভাববিশিষ্ট। অন্যদিকে মানুষের দ্বারা মৃত্যুর কারণ হতে পারে এমন কোনো অন্যায় আচরণের বীজ শুভ্রার জীবনে ছিল অনুপস্থিত। কিন্তু মৃত্যু এই বিপরীতধর্মী দুই নারী-পুরুষকে একত্র করে দেয়। জীবনে যাদের কোনো যোগ ছিল না মৃত্যু এসে তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। গ্রামবাসীর কল্পনা, অনুমান, গুজবপ্রবণতা প্রভৃতি এ-দুই মৃত্যুর সম্পর্ক আবিষ্কারে তৎপর হয়ে কেবল বাস্তব তথ্যের অভাবে থমকে দাঁড়ায় ঠিকই, কিন্তু সেই ফাঁকটুকু ভরে দেয় ধর্মবোধ ও অজ্ঞতাপ্রসূত লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কারের মোহ। দুটি অপমৃত্যু গ্রামীণ মানুষের মনে যে আতঙ্ক ও ভীতির সঞ্চার করে তার সঙ্গে যুগ-যুগের সংস্কার যুক্ত হয়ে তাদের মধ্যে ভূত-বিশ্বাস— অর্থাৎ অপমৃত্যুর ফলে মানুষের আত্মা ভূতে পরিণত হয় এইরূপ ধারণা— তীব্র হয়ে ওঠে। এরই প্রভাবে আমরা লক্ষ করি, ঘটনার অল্প কিছুদিন পরে মৃত বলাই চক্রবর্তীর ভ্রাতুষ্পুত্র 'নবীনের স্ত্রী দামিনী সন্ধ্যাবেলা লণ্ঠন হাতে রান্নাঘর থেকে উঠান পার হয়ে শোবার ঘরে যাচ্ছে, কোথা থেকে অতি মৃদু একটু দমকা বাতাস বাড়ীর পূব কোণের তেঁতুল গাছের পাতাকে নাড়া দিয়ে তার গায়ে এসে লাগল। দামিনীর হাতের লণ্ঠন ছিটকে গিয়ে পড়ল দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায়, উঠানে আছড়ে পড়ে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে দামিনীর দাঁতে দাঁত লেগে গেল।' (৫।।৫১৪)। দামিনীকে ভূত আশ্রয় করেছে— এ-সম্পর্কে অধিকাংশের মনে যখন আর কোনো সন্দেহ থাকে না, তখন ওঝা এসে দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে তার চুল বেঁধে উৎকট গন্ধসৃষ্টিকারী শেকড় ও কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে নাকের সামনে ধরে দামিনীকে বাধ্য করে তার ভূতগ্রস্ততার কথা স্বীকারে। অবচেতন মনের সন্দেহ বিশ্বাস এবং ওঝার নিপীড়ন— এ-দুয়ের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ায় দামিনী বলে, 'সে শুভ্রা, তাকে খুন করেছে বলাই চক্রবর্তী। অর্থাৎ শুভ্রার মৃত আত্মা ভূত হয়ে দামিনীকে আশ্রয় করেছে— এ-সম্পর্কে কারো মনে এতটুকু সন্দেহের আর সুযোগ থাকে না। কিন্তু বলাই চক্রবর্তী শুভ্রার তিনদিন আগেই খুন হওয়ায় শুভ্রাকে সে কিভাবে খুন করতে সক্ষম হয় এ-সম্পর্কে যেটুকু সন্দেহ জাগে, ওঝা গুণু মাঝি ও বৃদ্ধ পঙ্কজ ঘোষালের ব্যাখ্যার পর তারও অবসান ঘটে।

> ... কথাটিকে সে ঘুরিয়ে দিল একটু অন্যভাবে, যার ফলে অবিশ্বাসীর মনে পর্যন্ত খটকা বাঁধা সম্ভব হয়ে উঠল। বলাই চক্রবর্তীই শুভ্রাকে খুন করেছে বটে কিন্তু সোজাসুজি নিজে নয়। কারণ, মরার এক বছরের মধ্যে সেটা কেউ পারে না, ওই সময়ের মধ্যে শ্রাদ্ধ-শান্তি না হলে তবেই সোজাসুজি মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতা জন্মায়। বলাই চক্রবর্তী একজনকে ভর করে তার মধ্যস্থতায় শুভ্রাকে খুন করেছে, তার রক্তমাংসের হাত দিয়ে। (৫।।৫১৮)

দামিনীর স্বীকারোক্তি ও এই বিশ্লেষণের পর অপপ্রচার বা কলঙ্করটনার ক্ষেত্রে আর কোনো কথা থাকে না। দুই মৃত্যুর মধ্যে যোগাযোগ আবিষ্কারের পর নারীঘটিত কেলেঙ্কারির গুজবে দ্রুত আচ্ছন্ন হয়ে যায় সমগ্র গ্রাম। আর গুজবের স্বভাবধর্ম অনুযায়ী, তা যত মুখ ও কান অতিক্রম করে, তত শাখা-প্রশাখা বিস্তারের মাধ্যমে হয় পত্রপল্লবিত। মানিক এ-গল্পে গ্রামীণ বাস্তবতার এই দুই বৈশিষ্ট্যকে— অর্থাৎ তার অজ্ঞতাতাড়িত কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ও অতিলৌকিক বিশ্বাস এবং কানাঘুষো ও কুৎসারটনার প্রবৃত্তিকে— অতিশয় দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। তবে বাস্তবতার এই একমাত্রিক উন্মোচনেই মানিক সীমাবদ্ধ থাকেন নি; তিনি এর সর্বগ্রাসী শক্তিকে— অর্থাৎ অজ্ঞানাবদ্ধতা, জনরব ও পরনিন্দা কর্তৃক বিজ্ঞানবুদ্ধিকে পরাস্ত করার সামর্থ্যকে— চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে শিল্পকুশলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। শুভ্রার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধীরেন-চরিত্রের রূপ-রূপান্তরের প্রতিচ্ছবিতে মূর্ত হয়েছে মানিকের এই শিল্পনৈপুণ্য। ফিজিক্সে অনার্সসহ বিএসসি-উত্তীর্ণ ধীরেন সাতবছর যাবৎ নিজ গ্রামের স্কুলে জিওগ্রাফির শিক্ষক। গ্রামে সে-ই একমাত্র, এবং পাশ না-করা, ডাক্তার। গ্রামে গিয়ে প্রথমে লাইব্রেরি নির্মাণ, তরুণ সমিতি গঠন, বই পড়ে সাধারণ রোগের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রভৃতি কার্যক্রম অতি উৎসাহে শুরু করলেও, একটি গ্রাম্যমেয়েকে বিয়ে করে দুবছরে চারসন্তানের জনক হওয়ার পর, ধীরেনের উদ্যম হ্রাস পায়। অন্যদিকে গ্রামবাসীর অনাগ্রহও এর অন্যতম কারণ। কেবল তার গ্রন্থবিদ্যানির্ভর স্বাবলম্বী চিকিৎসা-কার্যক্রমই অব্যাহত থাকে— যার সঙ্গে নতুনভাবে যুক্ত হয় অর্থবিনিময়ের প্রশ্ন। বিজ্ঞানমনস্ক ধীরেন দামিনীর চিকিৎসায় ওঝা-ডাকার বিরোধিতা করলেও তা অগ্রাহ্য হয়। তাছাড়া ওঝার অবৈজ্ঞানিক ও অমানবিক চিকিৎসাপদ্ধতির বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদও দামিনীর স্বামী ও উপস্থিত জনতার বিশ্বাসের কাছে হাস্যকর ঠেকে। অতঃপর ওঝার নিপীড়নমূলক চিকিৎসার প্রতিক্রিয়ায় দামিনীর স্বীকারোক্তি ও সেসবের সম্পূরক ব্যাখ্যার পর তার বোনের কাল্পনিক কেলেঙ্কারি ও কুৎসা নিয়ে যে-কানাঘুষো সমগ্র

ভাঙন। পুরোহিত ঠাকুরের উপদেশ, পথচারী ও ছাত্রদের সপ্রশ্ন চাহনি, স্কুল থেকে একমাসের বাধ্যতামূলক ছুটি প্রভৃতির সম্মিলিত আক্রমণ তার যুক্তিনিষ্ঠ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত মনকে দুমড়ে মুচড়ে পর্যুদস্ত করে দেয়। ধীরেনের গ্রাম্য অপবাদ-আক্রান্ত বেদনাজর্জর মনের প্রতিচ্ছবি অঙ্কনে মানিকের পারদর্শিতা লক্ষযোগ্য :

> এতক্ষণ খেয়াল হয়নি, এখন সে বুঝতে পেরেছে, নিয়মিতভাবে প্রতিদিন স্কুলে ছেলেদের পড়ানোর ক্ষমতা তার নেই। মথুরবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা হচ্ছে। চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে সে মাঠের পথ ধরে বাড়ী চলেছে। বাড়ী গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকোতে হবে। দুর্বল শরীরটা বিছানায় লুটিয়ে দিয়ে ভারী মাথাটা বালিশে রাখতে হবে। (৫।।৫২০)

মৃতের আত্মা ভূতে পরিণত হওয়া সম্পর্কে গ্রামবাসীর বিশ্বাস এবং সেই সূত্রে শুভ্রার কেলেঙ্কারি-কল্পনার ব্যাপকতায় ধীরেনের মন এই বিপুল মিথ্যার সামনে হয়ে পড়ে অসহায় ও শক্তিহীন। আর তারই পরিণতিতে, নিরুদ্যম নিরুপায়ত্বের সুযোগে বিজ্ঞানচেতনার আলো অপসারিত হয়ে ধীরেনের মন ভরে যায় অজ্ঞতার অন্ধকারে। মানবসভ্যতার বিকাশধারায় লক্ষণীয় যে, আমাদের মতো পশ্চাৎপদ দেশে অশিক্ষা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতি স্বাভাবিক প্রবণতা; এর বিপরীতে যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানবুদ্ধিকে কারো জীবনধারায় অঙ্গীকার করতে হলে সচেতন প্রয়াস, সংগ্রামশীল সাহসী মানসিকতা অবশ্যম্ভাবী। এর অভাব ঘটলে মনের পশ্চাদগমন অনিবার্য। ধীরেনের পরিণতির ক্ষেত্রে আমরা এই সমাজসত্যের রূপায়ণই লক্ষ করি। গল্পশেষে এই মানুষটিকেই দেখছি, ভূতের গমনরোধকল্পে আড়াআড়িভাবে রাখা দুশ্বান্ত-পোড়ানো বাঁশ ডিঙাতে ব্যর্থ হয়ে সে চীৎকার করছে এবং দামিনীর মতোই, ওঝার একই চিকিৎসাপদ্ধতির প্রতিক্রিয়ায়, স্বীকার করছে— সে বলাই চক্রবর্তীর মৃত আত্মারূপী ভূত যে শুভ্রাকে খুন করেছে। এমন স্বীকারোক্তির মধ্যে বোনের বিরুদ্ধে গ্রামময় বিস্তৃত কাল্পনিক কলঙ্ক দূরীকরণের অবচেতন ইচ্ছাও হয়ত ক্রিয়াশীল— এমন অনুমান আমরা করতে পারি। তবে ধীরেন-চরিত্রের পরিবর্তনচিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ বাস্তবতার ব্যাপকভিত্তিক প্রভাব ও শক্তিকে রূপায়িত করাই এখানে মানিকের মূল লক্ষ্য, সন্দেহ নেই। ধীরেন-চরিত্র বিশ্লেষণে সমালোচকগণও তা স্বীকার করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ :

> নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : ধীরেনের শোকার্ত মন, আত্যন্তিক ভাবপ্রবণতা, "জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংযোগ স্থাপনের" একটা অসুস্থ আবেগ— তাকে মনস্তাত্ত্বিকভাবেই প্রেতাশ্রিত করে তুলেছে। গ্রাম-জীবনের সাধারণ কুসংস্কারও এ ব্যাপারে অনেকখানি আনুকূল্য করেছে বলা যায়।[২৩] (১৯৫৮)

সরোজমোহন মিত্র : একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা ধীরেনের মনকে কিভাবে ধীরে ধীরে গ্রাস করল তার সুন্দর বর্ণনা আছে। যুক্তিবাদী বিজ্ঞানপড়া মনকে একটা ভৌতিক কুসংস্কার যে আচ্ছন্ন করতে পারে এই গল্পে তার সুন্দর বিশ্লেষণ আছে।[২৪] (১৯৭০)

শিখা ঘোষ : বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও ভৌতিক কুসংস্কারের আবহাওয়ায় বাস করতে করতে ধীরেন শেষপর্যন্ত নিজেই তার বশীভূত হয়ে যায়। চরিত্র নির্মাণে মানিকের এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির প্রক্ষেপ শুধু ধীরেনের উপরেই নয়, অন্যান্য অনেক চরিত্রের উপরেই লক্ষ্য করা গেছে।[২৫] (১৯৯০)

বলাবাহুল্য, ধীরেন-চরিত্র উদঘাটনে মানিক সুতীক্ষ্ণ বাস্তবতাবোধের স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে এই চরিত্রের পরিণতিসূত্রে সমগ্র গল্পে ভৌতিক সংস্কারের যে-জয়ধ্বজা উড্ডীন হয়েছে তাকে বাস্তবতার উন্মোচন বলার পরিবর্তে কেউ কেউ একে মানিকের ভূতবিশ্বাস-সম্পর্কিত দুর্বলতা বলে ইঙ্গিত করেছেন। সমগ্র গল্পের রসাবেদন বিশ্লেষণে তাই বিভিন্ন মতের সমাহার লক্ষণীয়। অথচ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজ্ঞানমনস্ক জীবনধারা অনুসরণ করলে তাঁর শিল্পিসত্তায় এমন কুসংস্কারপুষ্ট দুর্বলতার উপস্থিতির প্রশ্নটি সত্যি সত্যি অকল্পনীয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকাল জুড়ে ছিলেন সর্বাংশে বিজ্ঞানের পূজারী, বাস্তববোধের প্রবক্তা এবং সকল প্রকার অন্ধত্ব, গোঁড়ামি ও অলৌকিক বিশ্বাস থেকে মুক্ত। তার এমন একটি ক্ষুদ্র সৃষ্টিও সুলভ নয়, যেখানে তিনি যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। *হলুদ পোড়া* গল্প-প্রসঙ্গেও এ-বক্তব্য প্রযোজ্য। তবে এ-যুক্তির যাথার্থ্য নিরূপণের পূর্বে আলোচ্য গল্প সম্পর্কে সমালোচকদের মূল্যায়নসমূহ বিবেচনা করা আবশ্যক। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ এক্ষেত্রে অনুসরণীয় :

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'হলুদ পোড়া' সম্পর্কেও সংশয় জাগে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করতেন? তাঁর জীবনদৃষ্টি এবং সাহিত্যধারা তার বিপরীত সাক্ষ্যই দেবে। অথচ 'হলুদপোড়া' গল্পে ধীরেন যখন এক অদ্ভুত সন্ধ্যায় ভূতগ্রস্তের মতো রক্তাক্ত চেহারা নিয়ে ঘরে ফিরে আসে, কুঞ্জ গুণীর কাঁচা হলুদ পোড়ার প্রভাবে যখন সে জবাব দেয় 'আমি বলাই চক্রবর্তী, শুভ্রাকে আমি খুন করেছি'— তখন প্রেতপ্রত্যয়ের মধ্যেই গল্পটির নিষ্পত্তি হতে চায়। পরিবেশ-রচনার অসামান্য নৈপুণ্য এই প্রত্যয়কে দৃঢ়তর করে।

বস্তুত গল্পটি মানসিক বিসর্পিলতার একটি ভয়াল নিদর্শন। ... কিন্তু ভৌতিকতার পরিবেশ সৃষ্টিতে লেখকের কৃতিত্ব গল্পটিকে বিকেন্দ্রিত করেছে— 'communication'-এর 'False indication' উদ্দিষ্ট সিদ্ধান্তের বিপরীতেই পাঠকের মনকে পৌঁছে দিয়েছে।[২৬] (১৯৫৮)

সুনীল চক্রবর্তী : মানিকবাবুর জীবনদর্শন ও সাহিত্যধারার বিপরীত কোটিতে 'হলুদ পোড়া'র অবস্থান। হলুদ পোড়া নিছক প্রেতাতংক-আশ্রয়ী অলৌকিক রসের ভৌতিক গল্প।[২৭] (১৯৭১)

শিখা ঘোষ : এক লোকায়ত ভৌতিক সংস্কারের ভাবভূমিতে জন্ম নিয়ে 'হলুদ পোড়া' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প সমগ্রের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছে। তীব্র আকারে না হলেও ভৌতিক সংস্কার ও বিজ্ঞান চেতনার মধ্যে দেখা দিয়েছে দ্বন্দ্ব। যদিও এই দ্বন্দ্বে জয়ী হতে দেখা গেছে ভৌতিক সংস্কারকেই। ... ভৌতিক সংস্কারের উপর গড়ে উঠলেও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ এই গল্পের প্রশংসনীয় দিক।[২৮] (১৯৯০)

*হলুদ পোড়া* গল্প সম্পর্কে সমালোচকদের এসব অভিযোগ যুক্তিযুক্ত কিনা, সেটাই বিবেচ্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও সুনীল চক্রবর্তীর সিদ্ধান্তমূলক মন্তব্য তর্কাতীত নয়। একজন বিজ্ঞাননিষ্ঠ বাস্তববাদী লেখক যখন তার যুক্তির সীমানার বাইরে অবস্থিত কোনো বাস্তবতার চিত্রাঙ্কনে সচেষ্ট হন, তখন শিল্পী হিসেবে ওই বিষয়ের প্রতি সৎ থাকা তার জন্য অনিবার্য। এটি কোনো দোষের বিষয় নয়। আমাদের দেখা প্রয়োজন, এই সততার সূত্র ধরে লেখকের জীবনবোধের বিপরীত কোনো দুর্বলতার প্রকাশ ঘটে কিনা। অর্থাৎ কোনো লেখকের রচনাপাঠের পর তাঁর জীবনাদর্শবিরোধী কোনো বাস্তবতার প্রতি পাঠকের আস্থা সৃষ্টি হলে তখনই আমরা ওই শিল্পীর ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করতে পারি। অতএব, *হলুদ পোড়া* গল্প পাঠের পর আমাদের মনে ভূতবিশ্বাস দৃঢ়মূল হয় কিনা, সেটাই বিবেচনার বিষয়। কেননা এর সঙ্গেই জড়িত মানিকের আদর্শবিচ্যুতির প্রসঙ্গটি। গল্পবিচারে দেখা যায়, বলাই চক্রবর্তী ও শুভ্রার মৃত্যু অস্বাভাবিক হলেও তা ব্যাখ্যাতীত বা অতিলৌকিক নয়। উভয় হত্যার পেছনে মনুষ্য হাত যে সক্রিয় তার স্পষ্ট ইঙ্গিত গল্পমধ্যে বর্তমান। দামিনীর ভূতগ্রস্ততা প্রমাণে ওঝার নির্মম নির্দয় চিকিৎসাপদ্ধতি পাঠকের সামনে মন্ত্রের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। অন্যদিকে কৈলাস ডাক্তারের আগমনের পর ওঝার প্রাধান্য যেভাবে ভূলুণ্ঠিত হয় তাতেও গুণী মাঝির অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসাধারার হাস্যকরতা হয়ে ওঠে স্পষ্ট। 'ভূতগ্রস্ত' দামিনীর স্বীকারোক্তির পর বলাই চক্রবর্তী ও শুভ্রার মৃত্যুর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের যে-প্রচেষ্টা, তাকে কষ্টকল্পনা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। গ্রামীণ জনসাধারণের অজ্ঞানাবদ্ধ পশ্চাৎপদতার সুযোগেই এমন আকাশকুসুমকল্পনা ভিত্তি অর্জনে সক্ষম হয়। আর ধীরেনের মানসিক পরিবর্তন বা মনোব্যাধিগ্রস্ততার মূলে রয়েছে গৃহ-সমাজ-স্কুল প্রভৃতি বহির্জগতের এক প্রচণ্ড চাপের কাছে নিজের অসহায়ত্বকল্পনা। সুতরাং এ-গল্প আমাদের ভূতবিশ্বাসকে দৃঢ় করে এমন অভিযোগ একেবারেই অযৌক্তিক। সে-কারণে বিজ্ঞানচেতনার সঙ্গে দ্বন্দ্বে ভৌতিক সংস্কারের

জয় হয়েছে— এমন বক্তব্যকে মান্য করাও সম্ভবপর নয়। এ-গল্পে যদি কিছুর জয় হয়ে থাকে, তা হলো : মানিকের শিল্পনিপুণতার। আর এ-গল্প প্রসঙ্গে শিখা ঘোষের ওই বক্তব্যটিই অধিকতর যথার্থ; তা হলো : "মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ এই গল্পের প্রশংসনীয় দিক।" সরোজমোহন মিত্রের আলোচনায় বহু পূর্বেই এর সমর্থন মেলে। "গ্রামজীবনে ভৌতিক কুসংস্কারে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তারই এক অনুপম মনস্তাত্ত্বিক গল্প"[২৯] বলে তিনি একে অভিহিত করেন। তাছাড়া এ-গল্প সম্পর্কে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ নারায়ণ চৌধুরীর। তাঁর মতে :

> হলুদপোড়া গল্পে একটি গ্রাম্য কুসংস্কারকে (লোকের উপর ভূতের ভর হওয়া ও ওঝার চিকিৎসায় সেই ভূতঝারানোর চেষ্টা) এক হাত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওই কুসংস্কারের এখনও যে কতখানি শক্তি বিদ্যমান তাও দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ তীক্ষ্ণ সমালোচনা সত্ত্বেও গল্পটির মধ্যে বাস্তববোধ বিলক্ষণ মাত্রায় বর্তমান। ...[৩০]

একদিকে মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ অন্যদিকে গ্রামীণ বাস্তবতার সুনিপূণ চিত্রায়ণ— এ দুটোই আলোচ্য গল্প প্রসঙ্গে মূলকথা। বাস্তবে অস্তিত্বহীন অথচ কল্পনাকাশে দৃঢ়ভাবে বর্তমান, ভূতের প্রভাব আমাদের জীবনধারায় কীরূপ ভয়াবহ পরিণাম সৃষ্টিতে সহায়ক— তার রূপায়ণই ছিল মানিকের লক্ষ্য। স্মরণীয় যে, এরূপ কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাসের মূলে রয়েছে সনাতন ধর্মেরই কতিপয় ধারণা, বোধ বা নীতি। ধর্মগ্রন্থে আত্মার অবিনশ্বরতা, জন্মান্তরবাদ, কর্মফল অনুযায়ী আত্মার রূপান্তর প্রভৃতি সম্পর্কে যেসব ধারণা ব্যক্ত হয়েছে, ভূতকল্পনার সঙ্গে তারও রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগ। 'ভূত' প্রজাতির একটি শরীরী প্রাণীর অস্তিত্বকল্পনাও ভারতবর্ষীয় ধর্মগ্রন্থে লক্ষণীয়। ধর্মগ্রন্থে ভূত কল্পিত হয়েছে দেবতা ও মানুষের মধ্যবর্তী প্রাণীরূপে। দেবতা হতে জন্ম দশপ্রকার প্রাণীর মধ্যে ভূত অন্যতম। শাস্ত্রীয় এই ধারণার সঙ্গে মানুষের আরও অনেক লোকবিশ্বাস লোকসংস্কার যুক্ত হয়ে ভূতের অস্তিত্ব এখন মানুষের অনিষ্টসাধনে তৎপর একপ্রকার অলৌকিক প্রাণী হিসেবে। পার্থিব জীবনে অত্যাচারী কিংবা অন্যায়কারী কোনো মানুষের অপমৃত্যুর ফলে তার আত্মা স্বর্গারোহণে অসমর্থ হয়ে প্রবল অতৃপ্তি ও যন্ত্রণাসহ ভূতে পরিণত হয়; এবং স্বর্গলাভে ব্যর্থতা ও মোক্ষলাভে অতৃপ্তিই তাকে মানবের অকল্যাণসাধনে প্ররোচিত করে। ভূত-সম্পর্কিত এই লৌকিক বিশ্বাস আর্কিটাইপরূপে অঙ্গীভূত হয়ে আছে আমাদের জীবনধারায়। আর্কিটাইপ সম্পর্কে মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমরা *টিকটিকি* গল্পবিশ্লেষণকালে উপস্থাপন করেছি। আসলে আদিকাল থেকে পুরুষানুক্রমে নানাবিধ কাল্পনিক ধারণা বিশ্বাস বা সংস্কার ক্রমবিবর্তনের ধারা বেয়ে আজও মানুষের মনের মধ্যে বহমান। ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্জ্ঞান মন নয়, জাতিগত সচেতন মনই এসবের ধারক। আধুনিক মনোবিজ্ঞান এই প্রাচীন জাতিগত নির্জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যকেই আর্কিটাইপ নামে অভিহিত করছে। মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায় *হলুদ পোড়া* গল্পে বিশ্লেষণ করেছেন আমাদের জীবনপ্রবাহে ভূতসংস্কার-সম্পর্কিত আর্কিটাইপের স্বরূপ। কোনো একটি কল্পবস্তুকেন্দ্রিক এই জাতিগত নির্জ্ঞানতার চাপ ব্যক্তিমানসের ভারসাম্যচ্যুতির কারণ হয়ে তাকে কীভাবে ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে— তারও পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে এ-গল্পে। স্মরণীয় যে, সর্বাবয়বে বিজ্ঞানমনস্ক মানিক সামাজিক ও শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে সর্বদা শিল্পী হিসেবে সংগ্রাম করেছেন। তাঁর প্রথম পর্যায়ের রচনায় মনোজগৎ উন্মোচনের যে-আগ্রহ, তাতে অন্তর্জাগতিক এই সংগ্রামস্পৃহাই ছিল সক্রিয়। এ-গল্পেও আমরা জাতিগত পশ্চাৎপদতার স্বরূপ ব্যাখ্যা, তার বিনাশী শক্তি সম্পর্কে সতর্কতা এবং সর্বোপরি তা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হতে দেখি।

উপরের আলোচনায় স্পষ্ট যে, মানিক মানুষের মনোব্যাধিগ্রস্ততার জন্য কোনো একটি কারণকে দায়ী করেন নি বা প্রাধান্য দেন নি। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, অবচেতন মনের লিবিডো, কোনো আকাঙ্ক্ষার তীব্র অবদমন, সহনাতীত কোনো আঘাত বা মানসিক চাপ, সামাজিক কুসংস্কারের প্রাবল্য প্রভৃতি নানা কিছু মানুষের সহজ-স্বাভাবিক-সুস্থ জীবনধারাকে ব্যাহত করতে পারে। মানুষের মনোগত অসুস্থতার সঙ্গে সমাজসম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাকেও মানিক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেছেন। অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মানিকের চেতনা তাই বহুমাত্রিকতায় যেমন দীপ্ত, তেমনি সুগভীর জীবনবোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

## তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১ *বাংলাগল্প বিচিত্রা*, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৩৬৪ (১৯৫৮), পৃ ১৫৭-৫৮

২ *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, অষ্টম সংস্করণ : ১৯৮৮, পৃ ৫২৯

৩ 'আহুতি' নামে এ-গল্প প্রথম সংকলিত হয় 'শ্রীমতী' (১৩৩৭) নামক গল্পগ্রন্থে। অর্থাৎ এ-গল্প ১৯৩০ সালের পূর্বে রচিত বলে ধারণা করা যায়। তবে 'কলঙ্কিত সম্পর্ক', 'আহুতি' গল্পের পরিবর্ধিত রূপ। 'কলঙ্কিত সম্পর্ক' নামে গল্পটি প্রথম সংকলিত হয় *জগদীশচন্দ্র গুপ্তের স্ব-নির্বাচিত গল্প* (১৯৫৯) নামক গ্রন্থে।

৪ *কালের পুত্তলিকা*, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ ৪৪৪ দ্রষ্টব্য।

৫ *ফ্রয়েড*, সুনীল কুমার সরকার, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ : ১৯৯০ (প্র. প্র. ১৯৮০), পৃ ৭৮

৬ *Abnormal Psychology and Modern Life*, James C. Coleman, D.B. Taraporevala sons and Co. private Ltd., Bombay, India, Fourth Indian reprint, 1975 (F.P. 1950), p. 227

৭ ibid.

৮ *A General selection From the works of sigmund Freud*, edited by John Rickman, Allahabad, India, 1941, p 296

৯ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজজিজ্ঞাসা*, ড. নিতাই বসু, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ : ১৯৮৬ (প্র.প্র. ১৯৮০), পৃ ২৪১

১০ আন্তর্জাতিক ছোটগল্প ও সমাজ জিজ্ঞাসা, সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা, প্র.প্র. ১৯৯০, পৃ ৩৫

১১ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, সরোজমোহন মিত্র, কলকাতা, তৃ.সং ১৩৮৯/১৯৮২, পৃ ১৪২

১২ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ ১১১

১৩ *আন্তর্জাতিক ছোটগল্প ও সামজ জিজ্ঞাসা*, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৫

১৪ *Abnormal Psychology and Modern Life*, ibid, p 244

১৫ *Modern Man in search of a soul*, C.G. Jung, tr. by W.S. Dell and cary F. Baynes, London, 1961 (F.P. 1933), see : chapter : 'The Aims of psychotherapy', p 63-84.

১৬ ibid, p 144

১৭ *Essays on Contemporary Events*, C.G. Jung, tr. by Elizabeth Welsh, Barbara Hannah and Mary Briner, London, 1947, Introduction, P.X.

১৮ *Modern Man In Search of a Soul*, ibid, p 155

১৯ *বাংলাগল্প বিচিত্রা*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৬১-৬২

২০ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৪৪

২১ *মানিক-সাহিত্য সমীক্ষা*, নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ ১২১

২২ *কালের পুত্তলিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৩৮

২৩ *বাংলাগল্প বিচিত্রা*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৬১

২৪ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৫৪

২৫ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : অবয়বগত বিশ্লেষণ*, শিখা ঘোষ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ ১৫৮-৫৯

২৬ *বাংলাগল্প বিচিত্রা*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৬২-৬৩

২৭ *মানিক স্মৃতি*, সুজিতকুমার নাগ সম্পাদিত, কলকাতা : ১৩৭৮, পৃ ২৯

২৮ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : অবয়বগত বিশ্লেষণ*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৬০

২৯ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৫৩

৩০ *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-মূল্যায়ন*, নারায়ণ চৌধুরী, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ ৮২